এলোমেলো
জীবন ও শিল্প-সাহিত্য

বিষ্ণু দে

ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী
৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

প্রকাশক :
শ্রীঅম্বিকাপদ বিশ্বাস
শ্রীরামপুর ; হুগলী ।

মুদ্রণ :
জ্যোতি প্রেস
১১৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯ ।

মূল্য : চার টাকা ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে

লেখকের নিবেদন

এই প্রবন্ধগুলি ১৯৩৮ থেকে প্রায় বিশ বছর ধ'রে নানা পত্রিকায় বেরিয়েছিল; হয়তো আমাদের বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়ার একটা ধারণা হতে পারে, এই ভেবে সহৃদয় পাঠকসমাজে একত্রে উপস্থিত করা হল। শ্রীমান হরপ্রসাদ মিত্রের কাছে এ বিষয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

ছবিগুলি ছাপা সম্ভব হল সাহিত্যপত্র এবং বাক্-এর শ্রীযুক্ত তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উদারতায়।

বার্য কারণে বইটিতে বিস্তর ছাপার ভুল থেকে গেল। পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা-সহ আশা করি মুখ্য ভুলগুলি শুদ্ধি-পত্রে সংশোধিত করতে পেরেছি।

সূচীপত্র



১২ বছরের বালক পিকাসোর আঁকা পোর্ট্রেট

এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য

বন্ধুর কথায় বারবার ভাবতে হয়।

অনেকদিন ধরে মাঝে মাঝে কবিতা লিখে' থাকি, যা লিখেছি তার আর কিছুতে না হোক্ নিছক বহরটায় কেউ কেউ সুপ্তিমগ্ন হন। অথচ বন্ধুর কথাটা উড়িয়ে দিতে পারি না; শুধু সৌহার্দ্য তার কারণ নয়, তাঁর সংবেদনশীল কাব্যসাহিত্যবোধ ও জাগ্রত মননে আমার শ্রদ্ধা দীর্ঘজীবী ও নিশ্চিত। মানবজীবনের বাস্তবে তিনি তাঁর বিশ্রামহীন কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন। বহুকাল ধ'রে দেখছি তাঁর মানবপ্রেমের ও নবজীবন নির্মাণে কর্মৈষণার নিষ্ঠা। আবার জীবনের নানা স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়ে সুকুমার বোধ বা শিল্পসাহিত্যে একটা সহজ রুচিতে বন্ধুবর চলতি রাজনীতির মধ্যে বিস্ময়করভাবে সজাগ। তাই তাঁর সমালোচনা জীবনের প্রশ্নে এবং কাব্যের জিজ্ঞাসায় উভয়তই আমাকে ভাবিত করে। কেন বর্তমান লেখকের কবিতা আজকাল তাঁকে যথেষ্ট নাড়া দেয় না, কেন তাঁর মনকে জীবনের বাস্তব-বেদনায় ও আস্তিক উৎসাহে উদ্দীপনায় নবজীবনের পাড়ে ভাসিয়ে তুলে' দেয় না? আবার, আগের কবিতার তুলনায়, "ঘোড়সওয়ার" "ক্রেসিডা"-র তুলনায়, এমন কি "পদধ্বনি" "জন্মাষ্টমী"-র তুলনায়, এমনকি "১৪ই আগষ্ট", "অবিচ্ছিন্ন কাব্য", "জল দাও"-র তুলনায় কেন আমার সাম্প্রতিক কবিতায় বন্ধুর চমক লাগে না কাব্যের চকমকি নৈপুণ্যের দীপ্তিতে? কেন তাঁর মনে হয় পরিণতির সেই চরম স্বাক্ষর আর নেই? কাজ বিষয়ে মর্যাদাবোধ নির্মাতা বা রচয়িতার মনে দুর্মর এবং এ অন্তরঙ্গ সমালোচনার উত্তরে নানান সাফাই আমিও গেয়েছি; বয়সের সঙ্গে জীবনবোধ ও টেকনীকের উপরে কর্তৃত্ব পরিণত হয়েছে, এ বিশ্বাস তো লেখকের থাকবেই। কিন্তু বন্ধুত্বের পারস্পরিকতায় যে কথা মুখে বলা যায়, সে কথা কাগজের শীতল প্রকাশ্যতায় লেখা অর্থহীন। তাছাড়া এও ভেবেছি হয়তো সমালোচনাটি ঠিকই। হয়তো বয়সের প্রভাবে আমার মনও বুড়িয়ে

গেছে। এবং হয়তো একদিকে যেমন জীবনের প্রবাহে পিছিয়ে' পড়েছি, বাস্তবের মুঠি ঢিলা হয়ে গেছে, তেমনি আবার কাব্যের সার্থক কলাকৌশলে যে মনের আততি প্রয়োজন সেই আততি বা পেশল জাগ্রত সেই উভবল মননও হারিয়েছি। ভাবি ভালোমন্দ প্রাচীন কবিতার হাজার মুখে হাজার বছরের অভ্যাসজাত গভীর ও ব্যাপ্ত সংবেদ্যতা ভালোমন্দ নতুন কাব্যে কেন ঘনায় না ?

আমার এই চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অন্যান্য ও তরুণতর বন্ধুদের কথায় সমর্থিত। তাঁরাও কেউ কেউ বলেন যে, তিরিশ দশকের কবিরা আজ প্রায় নিঃশেষ, কাব্যলোকের সীমান্ত থেকেও তারা বুঝি নির্বাসিত। কেউবা বলেন, বারবার বা আস্তে আস্তে বা মনোযোগ দিয়ে যে কবিতা পড়তে হয়, পড়ে একা একা ভেবে তৃপ্তি পেতে হয়, সে কবিতার জীবনের আবেগ কম, সে কবিতায় যে তোরেয়াদর্ জীবনের দুই শিং ধরতে পারে নি। শিল্পীরা তো একপ্রকার তোরেয়াদর্-ই বটে, শুধু তাদের ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইটা আরো বিস্তৃত, আরো জটিল, কারণ এই নন্দীটির একটি শিং যদি হয় জীবনের বাস্তবতার এদিকে চাপ তাহলে অন্য শিংটি, বলতে হয়, ঐ জীবনের চাপকে রূপদানের প্রয়াস ওদিকে ঠেলা। কেউ কেউ বলেন, জীবনকে ধরা যায় লড়ায়ের মাঠে, উচ্চকণ্ঠে তারস্বরে, মিটিঙে, মিছিলে। এর বিপরীত কথা আবার বিমূঢ় করে' দেয় আরেকভাবে : কবিতায় নাকি বাস্তব প্রাত্যহিক জীবন উঁকি দিলেই কবিতা মাটি। পর্দানশীন এ মতের ভ্রান্তিবিলাস আলোচনা না করেও বলা যায় যে এ মতে দাক্ষিণ্য বড়োই দলীয়। এঁরা সুকান্তের কবিতা একেবারে তুচ্ছ করেন তার সোজা আবেদন বা উচ্চস্বর বা রাজনৈতিক অলঙ্কারের যুক্তিতে। অথচ বিপরীত রাজনীতির উচ্চকণ্ঠ অন্য কবিদের স্তুতিবিহার থেকে এঁদের থামাতে পারে না।

আবার, এঁদের অনেকেই সাজপোষাক পরেন পরলোকগত শুদ্ধ-কাব্যের ভক্তের। বেশ কিছুকাল ধরে' নানাকারণে এইরকম বামেতর রাজনীতির ছদ্মবেশী পক্ষপাত দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যের নানা দিকে,

তার মধ্যে "কবিতা" পত্রিকার সম্প্রতিকার কাব্যবিলাস উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এই পত্রিকাটির মালিক ও সম্পাদক আমার বহুবছরের বন্ধু এবং এর সঙ্গে আমার যোগ এর জন্ম থেকে, তাই নির্ভয়ে নিজের কথা দিয়েই আমার উদাহরণটি দিই। মজা লেগেছিল সম্প্রতি কবিতা-পত্রে একটি লেখা পড়ে', আমারই কবিতার এক আলোচনায়। [এই প্রবন্ধটি লেখার পরে বছর ঘুরেছে। এখন লিখলে লেখক নিশ্চয়ই এ উদাহরণ নিতেন না। মণীন্দ্র রায়ের বইটির রাজনৈতিক রিভিউটি ধরেও বক্তব্য পরিষ্কার করা যেত।] তাতে লেখক যে স্থানে অস্থানে পিঠ চাপড়েছিলেন সেটা আমার ভালোই লেগেছিল মানতে হবে, কেউ পিঠ চাপড়ে দিলে যে মন্দ লাগেনা বিশেষত যদি পিঠটা বিস্তৃত হয় একথা বৃদ্ধ মাত্রেই মানবেন। মজাটা হচ্ছে লেখকের দাক্ষিণ্যের স্বাভাবিক অর্থাৎ দলীয় বা রাজনৈতিক কার্পণ্যে অথচ অধমের কবিতার বিষয়ে একটা সন্দিগ্ধ অমৃতভাষিত দোমনাভাবেঃ—বামপন্থী বা পরিবর্তনবাদী কবিতা মাত্রেই জাতে খারাপ কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বোধহয় কিছুটা ক্ষমা করা যায়, যার মূল যুক্তি অবশ্য আমার প্রগতিবাদের অনুগ্রতা। কিন্তু জীবনে যার আনাগোনা তার কবিতা ভালো-টে হ'লেও ঠিক ভালো নাকি হতে পারে না। নিদেন তার ছন্দব্যবহারে—ছাপার ভুল ছাড়াও, দোষ থেকে যায়। কারণটা বোধহয় এই যে এ জাতের কবিতা পড়বার কবিতা, জীবন্ত ভাষার কথ্যছন্দের স্মৃতি এর বাহন। লেখক ছন্দের কান দুর্ভাগ্যবশত যান্ত্রিক বা মেট্রোনমিক, এজরা পাউণ্ড যাকে বলেছেন 'ট'ম-টি-ট'ম'-এর কান, যার লম্বা মিল তিনি পেয়েছেন 'বমে'। তাই শ্রীযুক্ত অরুণ সরকার ট্রাফিক আইনের শাদা দাগ কেটে বলেন যে এক লাইনে একাধিক এ-কার থাকলে নাকি সে লাইন অসহনীয়।—'মেলেনা পার্বতী পরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে'—তাই তিনি পড়েন—'রেএ বেতালগাজনে'। অথচ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ঝোঁক এবং অর্থের মাত্রা আমার পাঠটিতেই মেলে, যার ফলে পার্বতী পরমেশ্বরের একতার পরে নিঃশ্বাস পড়ে' আবার ওঠে এ বেতালগাজনের এ-র বিশেষ

ঝোঁকটিতে। অরুণের এ-কার বিষয়ে মন্তব্যটিও হাস্যকর—তিনি ভুলে গেছেন একটি বিখ্যাত এ-কার বহুল লাইন : এ লা সুআ ভলন্‌তাতে এ নস্ত্রা পাচে। ঐ নস্ত্রার আগের এ-টিতে স্বরের ঝোঁকই মনকে দুলিয়ে দেয়। বলা ভালো লাইনটি বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ লাইন বলে' আর্নলড থেকে এলিঅট সবাই একমত। স্বর্গের বহির্দ্বারে স্থিতাবস্থা সাধ্বী পিকার্দা, তিনি কেন বাইরে, দান্তের এই প্রশ্নে বলেছেন যে দান্তের প্রশ্ন তিনি বুঝতেই পারছেন না, কারণ : তাঁর ইচ্ছায় আমাদের শান্তি।

বস্তুত, জীবন্ত ভাষার কথ্য আবেগের যে ওঠাপড়ার ছন্দ আমরা অনেকে কবিতায় আনতে চাই, শুনতে চাই, সে ছন্দের পাঠ কারো কারো অভ্যাস নেই। বোধ হয় জীবন বিষয়ে মানবিক আবেগ না থাকলে এ ছন্দের স্বভাব স্নায়ুতে শিকড় বাঁধে না। অথচ প্রয়োজনীয় সংস্কারের শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার পরে আজ বাংলা কবিতার নিশ্চয়ই এই প্রাণময়তার দিকেই নির্দেশ। যে কোনো জীবন্ত ভাষায় কথা বলার চালের বাস্তবতাই কবিতার বাঁধা ছন্দকেও প্রাণময়তায় চালু ক'রে তোলে এটা আমরা পদ্যের বিকাশের ও নাট্যের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বুঝেছি। মাইকেলের ইওরোপীয় ঐশ্বর্যে বিস্ময়করভাবে প্রাণ দিয়েছে এই কথ্য-ছন্দের আভাস। ভরসার কথা অনেক নবীন কবির মধ্যে এই বোধ কার্যকর দেখি। তাই দেখি, শ্রীমান অরুণ যাই বলুন, সম্প্রতিকার কবিতার মধ্যে মণীন্দ্র রায়ের অনেক কবিতাতে ছন্দ এই জীবন্ত ভাষার রূপ পেয়েছে।

মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; নবীনতরদের মধ্যে অসীম রায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু— এবং আরো অনেকেই —সবাই কুশলী কবি এবং জীবন সম্বন্ধে সজাগ। জীবনের বাস্তবে এঁদের কবিমানসের শিকড়, তাই বোধ হয় কাব্যের রূপ বিষয়েও তাঁদের বোধ জীবন্ত। এঁদের অনেকের নিপুণ ছন্দব্যবহারে যান্ত্রিকতাবর্জন ও বিষয়নির্বাচনের নৈর্ব্যক্তিক বিস্তার বয়স্ক লোককেও অবাক ক'রে দেয় নৈপুণ্যে ও সম্ভাবনায়।

অবশ্য শুনেছি এঁদেরও সমালোচনা : কেন এঁদের কবিতা জীবনের প্রজ্ঞায় আবেগে ভাসিয়ে দেয় না, কেন থেকে থেকে মনে হয় যে জীবনের চাপ কাব্যরূপের ছাঁচ-কে ছাপিয়ে গেল, কখনও বা মনে হয় রূপের ছাঁচে জীবনের ইস্পাত ঢিলা হয়ে' রইল। অবশ্য জীবনের ও কাব্য-রূপের একাকার নিশ্চয়তা সর্বদাই দুর্লভ। তাছাড়া কে জানে হয়ত আমিই পিছিয়ে পড়েছি, তালে তাল দিতে পারছি না নিজের বয়সের অভ্যাসিকতায়। তাই এ সমালোচনার দলে যোগ দিতে আমার দ্বিধা লাগে। অধিকন্তু, জীবিত ও জীবন্ত কাব্যবিচারে কীর্তির চেয়ে বিকাশের সম্ভাবনাময়তাই বাংলাভাষার লেখক হিসাবে আমাকে ভাবায়। আর, অন্যের কাব্যবিচারে অখণ্ড শ্রদ্ধা প্রাথমিক প্রয়োজন তো বটেই। বিনীত জিজ্ঞাসায় বারবার তাই বিচার করতে হয় অভাবটা রচনাটিতে না পাঠের দোষে। তাছাড়া একই কবিতার বিচার নানাভাবে করা যায়। একটি কবিতার এক স্বতন্ত্র বিচার সম্ভব, আবার সেই কবিতারই বিচার সম্ভব সেই কবির বিকাশের অঙ্গ হিসাবে, যেমন সম্ভব সমস্ত বাংলাসাহিত্যের অতীত ও ভবিষ্যৎ ধারার ইঙ্গিতে আরেক বিচার। অবশ্য আরো অনেকস্তরে কবিতার বিচার করা যায় এবং স্তরগুলি সংযুক্তও হতে পারে কিন্তু ঐ প্রথম তিনটি কবিকর্ম যাদের পেশা বা সখ তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। (এই দৃষ্টিতে মনে হয় অতীন্দ্রিয় স্বপ্নালুতা বা জীবনবিতৃষ্ণার চেয়ে প্রগতিবিশ্বাসের জীবন পরিগ্রহণ স্বতই সম্ভাবনাময়।) চিরকাল এই সত্য দেখা গেছে যে গোটা সমাজে যদি জীবনের কোনো চেহারাই না পাওয়া যায়, তাহলে শিল্পকর্মীদের মানস খোঁজে সেই সমাজের একটা কোনো জীবন্ত অংশে জীবনদর্শনের আশ্রয়, সংহতির কেন্দ্র। সেকালে, মধ্যযুগে প্রায়ই তাই শিল্পীরা ধর্মের কেন্দ্রিকতায় সেই শিল্পাশ্রয় পেয়েছেন, নাহলে পেতে হয়েছে লৌকিক জীবনযাত্রায়, গ্রামীন জীবনে অথবা সেই শ্রেণীর দিনরাত্রিতে, যার হাতে সমাজের ভবিষ্যৎ চেহারা।

মৃত্যুর ছদ্মবেশে যতোই দক্ষতা থাকুক, বিকাশের ভবিষ্যৎ নেই, তা

সে কি জীবনবেদে কি শিল্পসাহিত্যের ষড়ঙ্গে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণতঃ তিরিশের নিবাসী মণীন্দ্র রায় বা বিশের তীর্থযাত্রী প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাই ধরি। শেষোক্তের কবিতার পরিণতি দু'তিন বছরে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় তাঁর বিষয়ের পরিপাকে ও তার সঙ্গে অভিন্নহৃদয় কাব্যরূপের অধিকতর কর্তৃত্বে। কারণ শিল্পসাহিত্যে যে জীবটিকে পাকড়াতে হয়, তার দুটি শিংই ধরতে হয় একসঙ্গে। জীবনের বাস্তবতার দিকে বা কাব্যরূপবিলাসের দিকে কোনো দিকেই পক্ষপাত চলে না সৎকবির, যে কবির সঙ্কল্পাবেগ শুধু সুকুমার মনের খেলা বা একটি বা কয়েকটি চমকপ্রদ বা মনউদাসী কবিতা নয়, কবিস্বরূপের বিকাশে যাঁর আগ্রহ, যাঁর ব্যক্তিগত ভাবনাবেদনা সংহতি পায় নৈর্ব্যক্তিকের বৃহত্তর সততায় অর্থাৎ উৎসের সামাজিক সার্থকতায়।

তাই খুশি লাগল মণীন্দ্র রায়ের শেষ কাব্যগ্রন্থ পাঠে। আগে যে মনে হত থেকে থেকে মণীন্দ্রের নৈপুণ্য কবিতার বিষয়ধৃত আবেগ থেকে বেরিয়ে এসে চম্‌কিয়ে দেয় অথবা কখনো কখনো তাঁর বক্তব্যের মহৎ-ভার তাঁর কবিতার রূপে সঞ্চারিত না হয়ে দ্বৈত মর্যাদায় স্বকীয় হয়ে ওঠে, সে দ্বিধান্বিত ভাব "কৃষ্ণচূড়া"র অনেক কবিতায় মনে হল উত্তীর্ণ। এখন এ অভিজ্ঞ কবির কণ্ঠস্বর ও বিনীত বক্তব্য অভিন্নতায় প্রায় এক সংযত ও সার্থকরূপ পাচ্ছে।

কথা উঠবে কিন্তু ঐ যুগান্তরকারী উন্মাদনা, ঐ ভাবের প্লাবন? সুখের বিষয় মণীন্দ্র রায় ঐ উচ্চাশার লোভী কবল থেকে বেরিয়ে আসছেন। কারণ, পাঠকরাই মহাকবিকে বা যুগাবতারকে আবিষ্কারের দায়িত্ব নেবেন, কিন্তু আমরা যারা লিখি, আমাদের প্রয়োজন বিশৃঙ্খল বিড়ম্বিত সমাজে স্থির রাখা আমাদের কঠিন কৃশ সততা ও কর্মগত বিনয়। হয়তো বা আমাদের কারো কারো কোনো কোনো কবিতা পাঠে কোনো পাঠকের অবসর বিনোদন হবে, বা তাও হবে না। কারো বা মনের দিগন্তে চৈতন্যের রং আরো বিস্তৃত হবে, কারো বা জীবনের কোনো দিকে আলোকিত দৃষ্টি পড়বে, এইটুকুই যেন লেখকের আশা।

থাকে। আমরা যেন শুধু কবিতায় জীবনকে গড়ে দে'ব—বা অন্যপক্ষে জীবনকে উড়িয়ে দিয়ে চন্দ্রলোকে ঘর ভাড়া ক'রে' চলে যাব—সে আশা না রাখি। এবং যেন ভুলি না যে আমাদের মানবিকতার সবচেয়ে বিনীত আশার সার্থকতাও আমাদের ক্ষেত্রে শুধু জ্ঞানজ সঙ্কল্পে, ইচ্ছাপোষণে প্রমাণিত হবে না, হবে কবিকর্মেরই মধ্যে দিয়ে সঙ্কল্পের সমগ্রতায়।

॥২॥

এই সত্যটি বিশেষ করেই স্মরণীয় আমাদের পক্ষে, বাংলাদেশে, আমাদের দেশের এই অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট সমাজজীবনের আধুনিক মানুষদের পক্ষে। ইওরোপের বুর্জোয়াভিত্তিক বা সাম্যবাদী দেশে জীবনের রূপে শত জটিলতা সত্ত্বেও চেহারাটা বিশিষ্ট, কাঠামোটা স্পষ্ট। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমাদের জীবনের সামাজিক সাংস্কৃতিক চেহারাটা আজো স্পষ্ট হয় নি; দক্ষিণে বা বামেতরে স্পষ্ট হবার কথাটা ওঠেনা, কারণ স্পষ্ট চেহারা জীবনেই সম্ভব, মৃত্যুতে নয়। কিন্তু বামের যন্ত্রণাটা জন্মের মতোই দারুণ অনিবার্য, বামপন্থীই এলোমেলো জীবনকে চেহারা দিতে উৎসুক। এই মানবিকতার যন্ত্রণাই দেখি আমাদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাট্যে, চলচ্চিত্রে, চিত্রশিল্পে যেখানেই শিল্পকর্মী সংপ্রেরণায় সচেষ্ট।

কবিতায় তবু কিছু মুস্কিলআসান আছে হয়তো, কারণ জাতহিসাবে এই শিল্পকর্মটি অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক, আদিম। অবশ্য প্রতি কর্মে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই বিশিষ্ট, এবং আদিম শিল্পকর্মের সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও কবিতাকে ভোগ করতে হয়, আজকের সভ্য ও বিভক্ত বৃত্তি ও শ্রেণীর সমাজের চৈতন্যের খণ্ডিতাবস্থায়। তবু হয়তো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ ক্ষেত্রে প্রতীকে প্রতিমায় ছন্দে এবং সর্বোপরি কবিতার নির্বিশেষ আদিম স্বভাবগুণে এবং সংক্ষিপ্ততায় বা শুদ্ধতায় একটা সহজ ও সরল মায়ায় সংযোগ সাধন করতে পারে। নাট্যক্ষেত্রেও নাট্যের সাক্ষাৎ মায়ায় গিরিশ ঘোষের দেশে, শিশির

ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও যোগেশ চৌধুরীর ঐতিহ্যে শম্ভু মিত্রের মতো পরিচালক "পথিক", "চার অধ্যায়", "উলুখাগড়া" বা "রক্তকরবী"র, মতো নাটককে অতিপরোক্ষ জীবনছবিকেও দাঁড় করিয়ে দেন বহুরূপীর সমগ্র প্রযোজনার ও অভিনয়ের প্রাণবান একতায়। যে বোধ এখানে সাময়িকভাবে দর্শক শ্রোতাকে মায়ায় বাঁধে সেটা শুদ্ধ নাট্যের সন্ধানে তীব্র প্রযোজক ও সারা দলের আবেগের সাক্ষাৎ সামগ্রিকতাতেই সম্ভব।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই নাট্যশিল্পের রক্তমাংসলতা এই বাস্তবের আবহাওয়া শিল্পের মায়ালোক রচে না, অসহায় লেখককে নীরব শব্দকে গেঁথে গেঁথে অদৃশ্য কথা দিয়ে গড়ে তুলতে হয় তাঁর সামাজিক জীবনের ভাষ্যে বাস্তবমন্য ভুবন। অথচ ঐ মায়াবী হরিণ কেবলই আমাদের সমাজে মনে পালিয়ে' বেড়ায়। তাইতো তারাশঙ্করের মতো দরাজ লেখকও সাপুড়ে মেয়ের কাহিনী বলতে গিয়ে আধা শহুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাই অচিন্ত্যকুমার চাষাভূষার প্রতিশ্রুতি ছেড়ে এক অদ্ভুত পরমার্থে মন দেন এবং মন দিতে গিয়েও শ্রীম-র মতো আত্মদান করতে পারেন না, বরং চমকপ্রদ লেখনের ভাবনায় ভক্ত পাঠককে বিমূঢ় করে' তোলেন।

প্রসঙ্গত, আমারও মনে এল এই এলোমেলো জীবনের একটা গল্প। পরিচয়ের পঁচিশ বছর আমার কখনো লেখা হবে না, তাই ধূর্জটিপ্রসাদের মহাজনপন্থায় গল্পটা বলে' ফেলি উদার পাঠকের ভরসায় এবং ধূর্জটিবাবু ও হিরণকুমার সান্যালের ক্ষমা নিশ্চিত জেনে। একদিন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সেই সুপরিচিত পুতুলশোভিত বাড়ীতে পরিচয়ের আড্ডাতে এলেন এক তরুণ ইংরেজ বা স্কচ্। তাঁর পরিচায়ক বললেন যে তিনি সদ্য অকস্‌ফর্ড থেকে দর্শনে ডিগ্রী নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে অধ্যাপক হয়েছেন ; তিনি তিনদিন বিলেতী কারাবাস করেছেন, কারণ তিনি সোস্যালিষ্ট ; তাঁর নিজের বেনট্‌লি গাড়ী আছে, তাঁর বাবার রোলস্‌রয়েস। ম্যাগি-লিভ্‌রে বিলেতী যুবকের ডিবেট দলে এসেছিলেন লেবর্ দলের ছেলে হিসাবে। এসে উঠেছিলেন শিবপুর কলেজের বড়ো সাহেবের বাড়ীতে,

দেশী খাবার খেতে চেয়ে অপদস্থ হয়েছিলেন। সোফার আরামে ডুবে গিয়ে তিনি প্রায় শুয়ে পড়লেন কিন্তু আমাদের দার্শনিক মল্লিকদার বাজপাখীর চোখ থেকে মুক্তি পেলেন না। মল্লিকদা যথারীতি প্রশ্ন করলেন রিয়ালিটির বিষয়ে ম্যাগিলিভ্‌রের কি মনোভাব। ম্যাগিলিভ্‌রের উত্তরে মল্লিকদা মোটেই খুশী হন নি, কারণ তর্ক হলনা। কিন্তু ম্যাগি-লিভ্‌রের কথায় আমি তখনও পুলকিত হয়েছিলুম, আজও সেই উত্তরটি ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাইনা। তিনি বল্লেন যে, বাস্তব বা সত্য বা রিয়ালিটি এক তাজ্জব ব্যাপার, ও বিষয়ে ভাবতে গেলে তাঁর মনে হয় এ যেন এক নদীতে একপাটি জুতা খুলে' পড়ে ভেসে যাচ্ছে আর তিনি ধরতে যাচ্ছেন। মল্লিকদা এটা গাম্ভীর্যহানি ভেবে চটে' গেলেন কিন্তু পাঠক ভেবে দেখুন এই রূপকের কী অর্থগভীরতা। ধরতে যাচ্ছেন জলস্রোতে এক পাটি জুতা, কিসের জুতা? রবরের না চামড়ার? সাঁৎরে না ছপ্‌ছপ্‌ ক'রে? আরেক পাটি জুতা পায়ে রেখে? না পাড়ে ফেলে দিয়ে? নাকি সেটাও জলে ভাসিয়ে? প্রশ্নের শেষ থাকেনা, এবং জীবনের স্রোতে বাস্তবের সমস্যা ভেসেই চলে। রম্য রচনার ভাষায়, সেই সমস্যাই বাংলা সাহিত্যের সাবেক সমস্যা।

তরুণতর লেখকদেরও একই সমস্যা। এবং এ সমস্যার সমাধান নেই সহজের পথে, কাট্‌তির সোজা রাস্তায়, নেই খেয়ালের ময়ূরপঙ্ক্ষী চেপে খেলার দেশবিদেশে যাযাবর বিলাসে কাল্পনিক যতো উপেক্ষিতাদের সন্ধানে এই নরকে এক ঋতু ঐ নরকে এক রাত্রির অসংলগ্নতায়। তাই শক্তি-মান অনেক লেখকও এই সমস্যাকে ধরতেই যান না। দেখা গেল অসীম রায় এই সমস্যাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মনে রাখা দরকার এই চেষ্টার কৃতিত্ব কতোখানি, কারণ এই সততার চেষ্টাও একান্ত দুর্লভ। "গোরা" "চতুরঙ্গ" ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের দুটি তিনটি উপন্যাসের পরে এ চেষ্টা হয়েছে কমই, এবং সামাজিক পরিবর্তনের তীক্ষ্ণ ও দ্রুত অনিশ্চয়তায় সে চেষ্টা হয়ে' ওঠে জটিলতর তন্মুতর বিশেষজ্ঞ চেষ্টা।

ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ের পরে এ চেষ্টাও খুব বেশি দেখা যায় নি। এমন কি অন্তঃশীলা থেকে মোহানার পরে তাই তিনিও আজকাল 'মনে এলো'-র জলে ভাসেন। অসীমের উপন্যাসদুটি পড়ে বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যতে আশ্বাস জাগল। অসীম রায় উপন্যাসের শিল্পাধার ও জীবনাধেয় উভয়—ও মূলত এক—বিষয়েই পরিশ্রমী সততার সন্ধানী। অর্থাৎ তিনি সহজ ও দ্রুত কোনো চটকদার সমাধানে অসত্যে কোনো বিপ্লব বা আশাকরি প্রতিবিপ্লব আনার ঔপন্যাসিক চেষ্টা করেন নি, আর পরিহার করে' চলেছেন আজকের তথাকথিত রম্যরচনার অনায়াস অল্পবয়স্কতা—কারণ লেখকের আত্মপ্রকাশের গরজ বা পাঠকের মনোরঞ্জনের ভ্রান্ত ধারণা কোনো দিক দিয়েই এই লঘুক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সার্থক হয় না। উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শন বা ধ্যানরূপটি অচ্ছেদ্য উপন্যাসরূপে তাই একাকার হয়। অসীমের উপন্যাসে আবেগের পরিচালনা অনিন্দ্য না হলেও তাঁর এই হাই সীরিঅস্‌নেস্‌ স্পষ্ট। বাংলায় বিশেষত আজকের দিনে ঐ দুর্লভ গুণটি একান্ত মূল্যবান, কারণ সামাজিক বিশৃঙ্খলার বা অস্পষ্টতার যুগে কালের চালু হাওয়াকে প্রতিরোধ না করলে লেখক শুধু চলতি ফ্যাশনেই আত্মদান করতে বাধ্য হন এবং তাতে তিনি আর সীরিঅস্‌ লেখকপদবাচ্যও থাকেন না; যেমন যে লেখক তাঁর কালকে অর্থাৎ সামাজিক জীবনকেও উপলব্ধি করতে চান না, তাঁর রচনা সুখপাঠ্য বা যাকে বলা হয় জনপ্রিয় হলেও সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। সাহিত্যকর্মও একরকম সংগ্রাম, স্থানকালকে জাপ্‌টে নিয়ে তাকে বশে এনেই লেখক তাঁর লেখকসত্তাকে, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে প্রকাশিত করতে পারেন তাঁর লেখার স্বকীয় অর্থাৎ জীবন্ত ছন্দে।

উপন্যাসে কালের এই মাহাত্ম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ উপন্যাসে মানবিক বা সামাজিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধনির্ণয়ই মূলভিত্তি, চিত্রশিল্পে যেমন চাক্ষুষের। উপন্যাসে শব্দের ও কথার ছন্দে, একপক্ষে যাকে বলে চরিত্র আর অন্যপক্ষে যাকে বলে প্লট একই বিন্যাসে গড়ে'

ওঠে এবং এই প্লটের ছাঁদে চরিত্রের রূপায়ণ আর চরিত্রের ছাঁচে প্লটের নিষ্কাশন একান্তভাবে নির্ভর করে লেখকের মনের সমাজচিত্রের উপরে। উপন্যাসে তাই মানবিকমূল্যবোধ বা সামাজিক পুরুষার্থ অন্যান্য অনেক শিল্পকর্মের তুলনায় প্রাথমিক। এমন কি বলা যায় যে এই ছন্দের পুরুষার্থেই উপন্যাসের একতা বা ঐক্যবোধ আসে, তথাকথিত চরিত্রের বিকাশের জীবনীমূলক পূর্বাপর ঐক্যমাত্রে নয়। তলস্তয়ের "মহাযুদ্ধ ও শান্তি" এর মহান্ উদাহরণ; বিরাট এক এপিক ঐক্য সেখানে একটি বা কয়েকটি চরিত্রের জীবনীর পরিণতিতে খণ্ডিত নয়, ঐক্যটি সেখানে অনিবার্য ঘটনাসমুদ্রের প্রবাহ ও প্রভাবের মধ্যে দিয়ে রূপ ধরে, লেখকের যে জগচ্চিত্র বা জীবনদর্শন তারই তরঙ্গায়িত সংহতিতে, যার প্রবল উর্মিভঙ্গে অভিভূত হয়ে আর্ণলড ভেবেছিলেন যে তলস্তয়ের উপন্যাস আর শিল্প রইল না, হয়ে উঠল মানবজীবন। এই সংহতির ছন্দময় প্রকাশধর্ম-গুণেই সীরিঅস্ বা সংদায়িত্বসম্পন্ন উপন্যাসে লেখক সাংবাদিক বিবরণে ক্ষান্ত হতে পারেন না, সব কিছুই করতে হয় প্রত্যক্ষাভাসে বা মায়ায় প্রদর্শিত, নাট্যরূপায়িত বা কাব্যাবেগ-সঞ্চারিত।

অসীম রায় প্রথমে "একালে কথা"-য় জীবনবোধ প্রকাশ করেন প্রদর্শনের পদ্ধতিতে, কিছুটা বা নাট্যাভাসে ফলে "একালের কথা"য় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংযোগবিয়োগে এবং সমগ্রের পরিণতিতে অনির্দিষ্টতা থাকলেও অনেক চরিত্রই এবং গোটা বইটির আবেগটি প্রাণময় হয়ে থাকে। আর এমনই শিল্পকর্মের প্রায় স্বাধীন মাহাত্ম্য, সন্নিহিত ছন্দের শক্তি যে লেখকের আপাতমনোনীত জীবনী-শোভন নায়কের চেয়ে বেশি জীবনময় হয়ে ওঠে সত্যগোপাল ও হাশেম। "এ কালের কথা"য় বোঝা যায় কেন লেখক পরিণতির এই অনির্দিষ্টতা মেনে নিয়েছেন। উপজীব্য জীবনে কোথায় সেই পারস্পরিক সংলগ্নতা, সেই সম্বন্ধবিস্তার যার পরিণতি মনে একটি নিটোল বাস্তবতা এনে দেয়? অসীম অবশ্য চেষ্টা করতে পারতেন ইচ্ছাঠাকরুণের দোহাই মেনে একটা কিছু রূপকজাতীয় দেনুমঁ বা অন্ত-রেশ এনে বই শেষ করতে। কিন্তু কবিতায় বা ছবিতে

যা চলে কর্মের বিশিষ্ট নিয়মে, উপন্যাসে তা হত ফাঁকি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবং "গোরা"য় বা "চতুরঙ্গ"তে কি নির্মমতায় তাঁকে এর সমাধান খুঁজতে হয়েছিল তা তো আমরা জানি। প্রত্যেক শিল্পকর্মীকেই সমানে আত্মত্যাগ করতে হয়, জয় করতে হয় অবান্তর নানা লোভ। না করলে অসামান্য প্রতিভার হাত থেকেও বেরিয়ে আসে "শেষের কবিতা", "চার অধ্যায়"।

দ্বিতীয় উপন্যাসে অসীমের চেষ্টা সমস্যার শিং আরেক ভাবে ধরবার, জীবনের বিস্তারে নয়, জীবনদর্শনের বিক্ষোভের ও সান্ত্বনার তীব্রতায়। গোপাল দেব যেন "একালের কথা"-র অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসেছে, কিছুটা জিতে কিছুটা হেরে, কিছুটা পরিপাক করে', কিছুটা বাদ দিয়ে। সে চায় জীবনের চেহারাটা ধরতে, তার জীবনে ভিড় করে আসা জীবনের নানা দাবিকে মেটাতে, আত্মরক্ষা করে' তার রূপটাকে ধরতে। রাজনীতির ঝোঁকের মৈত্রীউৎসাহের জগৎ সে ছেড়েছে, কারণ ঐ উৎসাহের ছকে জীবনের ছবি তার কাছে বাস্তবরূপ নেয়নি, জীবন তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। প্রতিক্রিয়ায় সে আজ একক মুক্তি চায়, সেভাবে দর্শক হয়েই আজ জীবনের খেঁড়নাট্যের মর্মটুকু সে ধরতে পারবে। তিক্ত অবজ্ঞায় ব্যঙ্গে সে দেখে তার চারপাশের কর্মের ও অকর্মের জগৎ ও মানুষগুলিকে। মনে হল এবারে বাংলায় ব্যঙ্গের একটি গোটা উপন্যাস পাব, যাকে বলে স্যাটায়ার। কিন্তু প্রকৃতি গোপালের জীবনে প্রতিশোধ নেয়, সরুমোটা দুটি তারে জট বেঁধে যায়। তুচ্ছ অসার সামান্য মানুষের ভিড়ে লেখক করুণা বা অনুকম্পায় রঞ্জিত করেন নায়ককে, যেন বা শুধু সেই অসামান্য, প্রজ্ঞায় হৃদয়বত্তায় অনন্য, কিন্তু যে-হেতু লেখক তার পারিপার্শ্বিক সহধর্মী সহকর্মীদের অনুকম্পার জলবায়ুতে ভাগ দেননি অর্থাৎ কার্যকারণে তাদের চরিত্র একই ছন্দের রক্তমাংসে গড়েননি, গড়েছেন বিতৃষ্ণার চতুর্‌রেখায়, তাই বেসুর বাজে নায়কের ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গত। অর্থাৎ মনে হয় গোপালদেবের একক অসামান্যতা লেখক পরোক্ষে রিপোর্ট

করেছেন, প্রত্যক্ষে রূপায়িত করেননি বা নাট্যে তা শরীর পায়নি যেটা আত্মজীবনীর স্বগত নাট্যে চললেও উপন্যাসে চলে না। এবং তারপরে আসে গোপালের প্রেম। আশ্চর্য শুচি ও দরদী নৈপুণ্যে লেখক এই এপিসোড লিখেছেন, তাঁর ধ্যানের শুদ্ধিতে মনোযোগের আত্মহারা তীব্রতায় এই ক্ষুরধার পথ তিনি প্রায় নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেছেন। কিন্তু মর্মান্তিক এই এপিসোড্ অন্তহীন। শিল্পরূপে এর শেষ নেই, পরিণতি নেই, জীবনে জীবন বাঁধা এবারেও বুঝি হলনা। এ রকম যন্ত্রণার পর্দায় শেষ জীবনে বা জীবনীতে স্বাভাবিক হলেও খুব কম উপন্যাসেই পেয়েছি।

ভাবছি এবারে অসীম রায় জীবনে ঝাঁপ দেবেন কোথায় কোন পাড় থেকে, একক ও ভিড়ের কোন্ সম্বন্ধপাতের বাঁকে কোন্ জোয়ার ভাঁটায়? গোপাল দেবের তীব্রতার রেশ মনে নিয়ে ভাবছি কেন সহস্রবাহু জীবন গোপালদেবকে, আমাদেরও এড়িয়ে যায়, রেখে যায় শুধু নয়নের মতো আশ্চর্য করুণ একজোড়া মাত্র বাহু, যে নয়ন নায়কের কাছে দামিনীর মতো আশ্চর্য প্রাণশক্তির এক করুণ ব্যক্তি-স্বরূপ? মনে হয় কেন আমাদের উপন্যাসে বিড়ম্বিত জীবনের পাক থেকে নায়ককে বা লেখককেই পালাতে হয় বিশেষ একটি উচ্ছল, প্রায় নিউরটিক অর্থাৎ বাস্তব নিরপেক্ষ প্রাণশক্তির প্রতীকের আকর্ষণের মধ্যে মুক্তির খোঁজে? রোহিনীতে যে আড়ষ্ট আরম্ভ সেই বিনোদিনীরাই তো দামিনীর মধ্যে নিটোল প্রাণময়তা পায়; সোহিনীতে তারই ভাঙন ধরে, তাকেই দেখি শরৎচন্দ্রের কমললতায়, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপে। অসীমের উপন্যাসে জীবনের বিড়ম্বনা এবং এক অসামান্য আর তাই হয়তো অপ্রাকৃত নায়িকার মধ্যে মুক্তির প্রতীকের এই প্রশ্ন ওঠে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নও কদাচিৎ ওঠে, কারণ জীবনের মধ্যবিত্ত চাপের তীব্রতার এবং তার সমাধানে অন্তত একটি নারীরও উচ্ছল প্রাণময়তার তীক্ষ্ণ বোধ দুই-ই দুর্লভ। অসীম রায় নবীন লেখক, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এই সীরিঅসনেসে, তাই তাঁর কাছে বাংলা উপন্যাসের

আশা বিস্তর। জীবনকে রূপের বাঁধনে ধরার চেষ্টা, বিপ্লবধর্মী যেমন ধরেন কর্মিষ্ঠ বিপ্লবের বাঁধনে, এবং ছকে ফেলে ধরার চেষ্টায় নয়, বিচিত্র রহস্যময় জীবনের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে, এই তো সৎ লেখক করতে পারেন। অশান্ত অস্থির জীবনের অস্পষ্টতা, অসংলগ্নতা, দুরূহতার সমাধান তো একলা লেখকের বা শিল্পীর হাতে নয়।

॥ ৩ ॥

মনে হতে পারে, হয়তো উপন্যাসের জাতবৈশিষ্ট্যেই এই অসম্পূর্ণতা আরো বেশি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু যে শিল্পকর্মে শুধু উপন্যাসের সুযোগসুবিধাটুকু ব্যবহার্য, আবার চিত্রের আবেদনের সুযোগসুবিধাও যার প্রধান হাতিয়ার, সেই মিশ্র উত্তরপ্রাথমিক কারু শিল্পকর্মে মনে হতে পারে হয়তো অধরা অনির্দিষ্ট আরো ভালো ভাবে ধরা পড়বে।

অবশ্য চলচ্চিত্রের জগতে মননশীল প্রয়োগে সচরাচর প্রয়োজকের উৎসাহ মেলে না, যার কারণ নাকি চলচ্চিত্রের ব্যয়বাহুল্য এবং বাজারের উপরে নির্ভরতা,—যদিও "পথের পাঁচালী"র জনপ্রিয়তা আবার প্রমাণ করেছে যে ভালো ফিল্মের জন্য আমরা সাধারণ মানুষেরা উদ্‌গ্রীব। আমাদের সৌভাগ্য যে সত্যজিৎ রায়ের মতো চলচ্চিত্রশিল্পী আমরা পেয়েছি। সত্যজিৎ তাঁর প্রথম নির্মাণেই যে চিন্তা, ধৈর্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে সহযোগিতা কার্যত গড়ে তুলেছেন, তার বীরত্ব গৌরবময়।

"পথের পাঁচালী" ফিল্ম্‌টি ঐ উপজীব্য উপন্যাসের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছে, আবার চিত্রের যে বিশেষ সুবিধা সে বিষয়েও শিল্পী সজাগ। দেশে শুচি ফিল্ম্‌ এতো কম যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ বোধ করি পথের পাঁচালীর শিল্পীদের কাছে। অবশ্য কথা উঠতে পারে যে এ ফিল্মে উপজীব্য উপন্যাসটির সুপরিচিত অনুষঙ্গ ও যশের সুযোগই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে, বইটির বৈশিষ্ট্য কমই প্রযুক্ত। ফলে শিথিল বাক্‌বহুল বইটির যে একরকম ঐক্য বা সংহতি আছে, তার

শৈথিল্য হয়তো ফিল্মের সময়নির্দেশে কমেছে, অন্যপক্ষে বইটিতে যে আবেগের, দরদের, স্মৃতির বেদনার সংহতিতে শৈথিল্যও প্রাণ পেয়েছিল, সে ছন্দের সংলগ্নতাটুকুও আর নেই। কারণ এও একরকম ঐক্য-সংযোগ, যখন দরদী স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসে-শ্বাসে বিলম্বিতলয় ঘটনাপরম্পরা একটি জীবনের, বা বলা যায় একটি জীবনীর আত্মীয়তার ঐক্যবদ্ধ হয়। বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি যে ফিল্মে তা করা যায়না এবং যেহেতু আমি আনাড়ী এবং পথের পাঁচালী কেন, কোনো ফিল্মেই কাজ করিনি, তাই এ কথার টেকনিকল্ অর্থ বুঝতে আমি অক্ষম। মার্কিন বা ইংরেজি গল্পের বাজারে চালু ফিল্মভাষ্যেও দেখা যায় যে বক্তার মর্ম-ভাষ্যের মধ্যে দিয়ে একটি গ্রাম কেমন করে' বদলে' গেল, কেমন করে লোকগুলির যৌবনবয়সজন্মমৃত্যু হল তা দেখানো যায়। সবুজ উপত্যকার কয়লাখনির করুণ ফিল্মেও কণ্ঠস্বরের এই সার্থক ঐক্য-বিধায়ক ব্যবহার মেলে।

অর্থাৎ রচয়িতার মানসলোক একটি চরিত্রের কাহিনীতে না পেলেও একটা কোনো বিন্দুতে কেন্দ্র পায়, যে কেন্দ্র থেকে শিল্পীর জীবনদর্শন বা ব্যক্তিস্বরূপের আবেগ নিজের আমোঘ ছন্দে সংহতি আনে এবং সেই সংহতির সংবেদন পাঠক-দর্শক-শ্রোতা-কে নিশ্চিত বোধে নিশ্চিত বোধে নন্দিত করে। বলাই বাহুল্য, পথের পাঁচালী বইতে সংহতির বোধটি এসেছে খুবই সহজভাবে, নায়কের অর্থাৎ অপুর মনের মধ্যস্থতায়। ফিল্মেও আসতে পারত তার অনুরূপ সংহতি। অথবা আসতে পারত দুস্থ বাংলার গ্রামের জীবনের নিঠুর বা অর্থহীন ঘটনা-পরম্পরার অসহায় ঔদাসীন্যের বেদনায়। বিভূতিভূষণের ত্রিশ বছরের আগের গ্রাম্যজীবনবোধের কারুণ্য ও স্মৃতির বিস্তার একালের শহরে নাকি অবাস্তব লাগত, যদিচ ১৯৫৫ সালেও বাংলায় বা ভারতের মানসে গ্রামীন প্রভাবটাই বড়ো সত্য। কিন্তু এই কারুণ্যের রেশ ও স্মৃতির বন্দিদশা যদি নাই সত্য হয় আরেক শিল্পীর মানসে এবং যদি ঐতিহাসিক রচনা বা যুগচিত্র হিসাবেও তিনি মূল কাঠামোর অনুগত

হতে না পারেন, তাহলে তার পরিবর্তে তাঁর নির্মাণ হবে আরেক সংহতিতে ছন্দায়িত। সেই জীবন দর্শনের ছন্দটি শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ জিজ্ঞাসায় এই অসামান্য ফিল্মে খুঁজেছি।

প্রথমে মনে হয়েছিল, একালের আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবনে যে একক ব্যক্তিত্বের অসংলগ্নতা পাই সত্যজিৎ রায় হয়তো জ্ঞাতসারে বা শিল্পধর্মের প্রচ্ছন্ন কিন্তু অনিবার্য কার্যকারণে স্থির চিত্রের নিঃসঙ্গ পরম্পরায় তারই এক করুণ ফিল্মিক রূপ দিয়েছেন। তাই এই ছবিটিতে আমাদের চেনা, বিদেশীর কাছে চমকপ্রদ গোটা গ্রামের জীবনের বোধ যা মানুষের আভাসে ইঙ্গিতে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে প্রতিবেশিত্বের নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ধরা যায়, সেই গ্রামের মূল বোধটি শিল্পী সঞ্চারিত করলেন না। এমন কি মানুষ কটির মনের জীবনও সংলগ্ন হল না, তাই কয়েকটি এপিসোড, কয়েকটি দুস্থ ব্যক্তির অসংলগ্নতার মর্মন্তুদ স্কেচ্ বা নক্সা পেলুম। প্রথম এপিসোড ইন্দির ঠাকরুণ, সংস্থান ও অভিনয়গুণে হয়তো আদিঅন্ত হিসাবে কিছু বেশি প্রাধান্য পেয়ে যায় দর্শকের মনে। তবে শিল্পী বোধ হয় তারও সমর্থন তৈরি করেছেন একটি নিপুণ ছোঁয়াচে। এই জীবনের অসংলগ্নতা বা বিচ্ছিন্নতার চিত্রপরম্পরায় ভাইবোনের, বিশেষত বোনের দিক থেকে প্রাথমিক পারস্পরিকতাটুকু ছাড়া, এক ইন্দির ঠাকরুণই সংযুক্ততার পরিচয় দেন গোটাফিল্মের মধ্যে একটু তাল-ফেরতায়—বিশেষ করে, সেই প্রশ্নটিতে : হাঁ গা, কি হয়েচে ?—হঠাৎ প্রতিভাত হয়, এই বৃদ্ধার যুক্ততা সমগ্র পরিবারটির সঙ্গে। এবং তাঁর মৃত্যুর পরে এর ছেদটা মনে হয় পরিচালকের উদ্দেশ্য। তাই ভাইবোনের পারস্পরিকতার উপরে, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগের উপরে বা গল্পপুরাণের কাব্যের প্রভাবেব ঐক্যের উপরে পরিচালক ঝোঁক দেননি ; দিলে দুর্গার মৃত্যুর পরে অপুর জীবন ও তার স্মৃতির গ্রন্থিবিস্তার অনেক বেশি মনোযোগ পেত। সেইজন্যই তো বহিপ্র্কৃতির বিশেষ ভৌগোলিক রূপটিকে পরিচালক পথের পাঁচালী-র লেখকের ঘনিষ্ঠ প্রেমে গ্রথিত করেন নি। ঐ প্রেমেই

গ্রামটি উদ্ভাসিত হয়, ঐ প্রেমেই মেলে দুর্গাঅপুর মনের মুক্তির মিল। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা কথা বলায়, বা না বলায়, কাছাকাছি দাঁড়ানোয় বা বসায়, চোখের চাওয়ায় মুখোমুখি বা মুখ ফিরিয়ে, ব্যক্তিত্বের নানা প্রকাশ ভঙ্গির অধরা আবহাওয়ায় পাওয়া যায়, মানবিক সম্বন্ধের সেই ঐশ্বর্যও ফিল্মে গৌণ করা হয়েছে, যদিচ পরিচালক অবশ্যই জানেন যে ছাপা বইয়ের চেয়ে দেখাশোনার ফিল্মে এই প্রকাশের নানা স্থূলসূক্ষ্ম রূপ সহজে বা সঙ্গতভাবে দেখানো যায়!

কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বাঁধা এই মানবিক নাট্য বোধহয় পরিচালকের উদ্দেশ্যই নয়। না হলে তিনি বিশেষ বিশেষ ভাবে বই থেকে ফিল্মে বারে বারে স'রে যাবেন কেন? আকস্মিকতার জন্য নয় নিশ্চয়ই? না হ'লে ফিল্মের ঐ বিশেষ শেষছবিরই বা তাৎপর্য কি? বিচ্ছিন্ন জীবন প্রায় অর্থহীন, তাইতো তার খাপছাড়া বেদনা, তার অসঙ্গতির তীব্র স্বর। ছবিগুলির নানা টুকিটাকিতে, স্টিল ফোটগ্রাফের মতো বিন্যাসের বিচ্ছিন্নতায়, রবিশঙ্করের ওস্তাদ সুরসংযোজনার নিপুণ কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও অনেক সময়ে বিযুক্ত চমকে এই নথিচিত্রমূলক বিশেষত্বই বোধহয় প্রকাশ পায়। তাই ইন্দির ঠাকরুণ যখন রূপকথা বলেন, তখন, দেওয়ালে তাঁর অতিকায় ছায়ার ভয়ঙ্করতা অসংলগ্ন, অর্থহীন। সেইজন্যই তো তাঁর দুই শ্রোতা সেই রাক্ষসীতুল্য বিরুদ্ধ রসাভাসের অপ্রাসঙ্গিক ছায়া দেখে না, দেখি আমরা। দেখি ঐ একবার বিচ্ছিন্ন ভয়ঙ্করতায়। আইসেন্‌স্টাইনের ফিল্মে ইভানের বিরাট ছায়া পড়ে, তার নাট্য আছে সেই দৃশ্যেই এবং আবার পরে লম্বিত সেই মুখই ছায়া ফেলে নাট্যের সুর পালটায় প্রায় দৃশ্যান্তরের মতো, যখন ইভানের মাথা ক্রমে ক্রমে পিছন দিকে ঝুলে পড়ে।

সেইরকম মনে হয়, যাত্রাদৃশ্যের বিরক্তিকর দৈর্ঘ্য, বা ব্যাণ্ড্‌বাত্তির বেসুর প্রাচুর্য, ফড়িং-মাকড়সার মাহাত্ম্য বা একটু অকালে প্রকাণ্ড এক অবাস্তব অর্থাৎ অবাস্ত সাপের মন্থর বিলম্বিত রূপক, আয়ুর্বৃদ্ধান্নে কালো শাড়ী, অস্থানে কুলকুচা, আতুরঘরের সামনে হরিহরের খড়ম

পায়ে কীথ্ সাহেবের চালে পায়চারি ইত্যাদি এসবেরই উদ্দেশ্য শিল্প-রচনার মধ্যে দিয়ে জীবনের অসংলগ্নতা, অবান্তরতা, অর্থহীনতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া। সেইজন্যই আলোকব্যবহার ও চিত্রগ্রহণের ভঙ্গীতে এবং ছবিগুলির যোজনাতে এই বিস্বাদ অর্থহীনতার ব্যঞ্জনা দর্শককে চম্‌কিয়ে চম্‌কিয়ে অভিভূত করে। সেইজন্যই তো ঋতুপরিবর্তনে গ্রাম্য জীবনের চেহারা এ ফিল্মে বদ্‌লায় না বা বদ্‌লায় একটা অসংলগ্নতার ছন্দে। এই দিক থেকেই বোধহয় বোঝা যায় কেন এই অসাধারণ পরিচালক বই থেকে নানা বিচ্যুতি করেছেন। মনে হয় যেন বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন ও গ্রামীন আবেগ এঁরা নিয়েছেন সমালোচনার মধ্যে দিয়ে, যেভাবে লেনিন একবার বলেছিলেন যে আমরা হেণ্ডরসনকে সমর্থন করি ফাঁসির দড়ি যেমন করে ফাঁসিতে চড়ানো লোকটিকে। কারণ বিভূতিভূষণের ভাবালু কিন্তু সৎ জীবনবোধ সত্যজিৎ রায়ের মতো দক্ষ শিল্পীর অনায়ত্ত একথা ভাবা নিষ্প্রয়োজন, ভাবতে হয় যে ঐ জীবনবোধ এই শিল্পীর কাছে অসার, অগ্রাহ্য। কারণ তাঁর কাছে আমাদের অধিকাংশের জীবন আজ বিচ্ছিন্ন, করুণ কিন্তু বিস্বাদ নিরর্থক, স্মৃতির বেদনার গতিতে ও সৌন্দর্যে আজ গরুর গাড়ীর পথও বাস্তব লাগে না, জীবনই আজ অচল!

আশা করি এই শিল্পী এবারে দেবেন তাঁর জীবনের বোধের পরিণত সংলগ্ন অপরাজিত রূপটি, যাতে পাব নিষ্করুণ বিচ্ছিন্ন দুস্থ জীবনেরও শিবনেত্র, ফিল্মের এক এপিক ছন্দসংহতি, অনিবার্য অর্থময়তা। সেই ফিল্মে গ্রাম হবে না নিপুণ চিত্ররাজির দৃশ্যমালা, চিত্রলতার ঝোঁক কেটে যাবে ছন্দের বা উদ্দেশ্যের সমগ্রতায় অথচ চিত্রগুলি হবে আরো চিত্রশিল্পময় অর্থাৎ কম্পোজড্, সন্ন্যস্ত। তখন আর শহরের মানুষ দুঘণ্টার জন্য বেড়াতে যাব না বাংলার দুস্থ গ্রামে অসুস্থ শহরের চোখ-কান মেজাজের তুচ্ছতা নিয়ে। যে জীবন আমাদের বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ কবন্ধ শহরে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই জীবনের মানুষগুলির শিশু-গুলির মন হয়তো কম এড়িয়ে যাবে আমাদের ফিল্মের আধানাগরিক

ভঙ্গুর মন থেকে। সত্যজিৎ রায়ের শুদ্ধ রুচি ও আধুনিক মননের কাছেই এ প্রত্যাশা পেশ করা যায়।

অবশ্য চলচ্চিত্রের বাধা অনেক, শিল্পকর্মহিসাবেই। তবু কিছু রুশ ফিল্মে আমরা তো দেখেছি এর রূপান্তর, এই শিল্পকর্মের জয়। নানা রকম তার রূপ, তার ছন্দ; ব্যক্তি ও ব্যক্তি, ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তি ও প্রকৃতি নানান্ সম্বন্ধপাতের সংলগ্ন রূপ দেখা গেছে টেকনীকের পরীক্ষায় অনলস সোভিএৎ ফিল্মে। ফরাসী, ইতালীয়, জাপানী ফিল্মও বাংলা ফিল্মের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি করেছে, যেমন ক'রে গেছেন আমাদের অতুলনীয় চ্যাপ্‌লিন। রূপকথারও ফিল্ম রূপায়ন দিয়েছেন কক্‌তোর মতো শিল্পী, তেমনি এলিঅটের কাব্যের রূপায়নও দেখা গেছে কলকাতায়। খাস চিত্রশিল্পের সুযোগ সুবিধা ফিল্মে পাওয়া নিশ্চয়ই শক্ত। কিন্তু চিত্রশিল্পেও সার্থকতা নির্ভর করে প্রতিভাবান্ শিল্পীর সঙ্কল্পের সমগ্রতা ও সততার উপরে। যে কোনো কর্মেই শিল্পীকে প্রতিভার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করতে হয়, নির্বাচন করতে হয় নিজের শিল্পীস্বভাবের সত্তায় সেই বিশেষ কেন্দ্রটি, জীবনের ব্যাপ্ত সমুদ্রে যে পঞ্চদলে বা সহস্রদলেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় জীবনদর্শনের স্বরূপ বা শিল্পীমানসটির প্রকাশকে। যামিনী রায়ের চিত্রশিল্পের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসে আমরা জীবন ও শিল্পের বিকাশের এই এক নিয়ন্ত্রিত জয়লাভ দেখি।

আধুনিক শিল্পী মাত্রেই সচেতন শিল্পী, আধুনিক শিল্পকর্মের বিকাশে দেখা যায় শিল্পকর্মই যেন আপন গরজে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে এবং তা উভয়তঃ মানবশিল্পে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থান গ্রহণ ক'রে বা সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে এবং দ্বিতীয়ত, আধুনিক দেশকালের জীবনোৎসারিত চৈতন্যের তীব্রতায়। কোনো দেশে কোনো শিল্পীর মধ্যে এই আত্ম-সচেতনতা প্রকাশ পায় বিষয়ের আপাতবোধ্য মাহাত্ম্যে, যদিচ সেখানেও দেশে দেশে শিল্পীতে শিল্পীতে তারতম্য বিস্তর। তাই কারো কাজে কখনো বা দেখা যায় তথাকথিত বিষয়ের বাস্তব বা প্রত্যক্ষ রূপদানের

ভাগিদ, কারো কাজে বাস্তব বিষয় হয়ে ওঠে কল্পনার বা রূপের পরোক্ষ-চাপে বহুভঙ্গ। কারো কাজে নির্মম মননের অস্থিরতা হয়ে ওঠে প্রধান, কারো কাজে বা চাক্ষুষ রূপের শান্ত স্থির স্পষ্টতাই মূল উদ্দেশ্য। যামিনী রায়ের বিচিত্র শিল্পপ্রবাহ যেমন অন্বেষায় অস্থির অশান্ত তেমনি তাঁর চিত্রের লক্ষ্য হচ্ছে শান্ত স্থির রূপ অর্জন। এই দুটিকে তুল্য মূল্যদান যে কোনো সমালোচনাতেই শুধু অসতর্কতাবশত ভ্রান্তিতে সম্ভব। কারণ আধুনিকতার অনিবার্য লক্ষণ হচ্ছে রূপায়নের টেকনীকে এই সচেতনতার আতত ছাপ, যে আততি যামিনী রায়ের কাজে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পায়, শুধু বিষয়ে নয়, জমির ব্যবহারে, রঙের টানে ও সম্বন্ধপাতে, রেখার স্নায়ুস্পন্দনের পরিণতিতে।

যামিনী রায়ের দীর্ঘকালের বহু চিত্রাবলী এবং অজস্র নক্সার কিছু দেখলেও তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে চিত্রকলার আত্মসচেতনতার আধুনিক অভিযানটি স্পষ্ট হয়। এবং মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ বিষয়ের আধুনিকতাও অবাক করে দেয়। যামিনী রায়ের মতো বহুকর্মা শিল্পীর কাজের ধারাবাহিক প্রাচুর্য দেখে নিঃশেষ করতে অনেক বছরের বিনীত মনোযোগ প্রয়োজন—যে কোনো শিল্পালোচনাতেই যা প্রয়োজন। এবং শিল্প সমালোচকের যদি নিজের বোধ না থাকে, নিজের রুচি যদি স্থির না থাকে, তিনি যদি কোনো বিষয়ে নিজের স্বভাব দিয়ে পছন্দ অপছন্দ নির্ধারিত না ক'রে থাকেন, তাহলে তাঁর আলোচনায় তথ্যের বাহুল্য হয় মূলত অর্থহীন, তত্ত্বকথা হয় এলোমেলো। তখন অজন্তায় ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চৈনিক চিত্রকলার সংমিশ্রণে লোকে খুঁজে পায় কাল্পনিক আদি ও অকৃত্রিম রূপশুদ্ধি, যদিচ অজন্তার ভ্রাম্যমাণ-গল্পচিত্রে চোখের শিল্পনিয়ম স্বভাবতই অনুসৃত নয়। কারণ শিল্পকার্যের প্রাথমিক বোধ না থাকলে পাঁচটা বই-এর পাতা উলটে বা না উলটে লাভ হয় হিতে বিপরীত; বিনীত অজ্ঞতার স্বাস্থ্য দাম্ভিক বা যশোলিপ্সু অর্ধপক্কতার চেয়ে সর্বদাই আশাপ্রদ। এবং অনেক তথ্যমূলক কাজে তথ্যের সংগ্রহ নিশ্চয়ই মূল্যবান, এমন কি বহরের গুণে এদিকে ওদিকে ত্বরিত

সমাধানের আশ্রয় নিলেও মোটের মাথায় একটা বড়ো গড়পড়তা তাৎপর্য থেকে যায়। কিন্তু শিল্প বা সাহিত্যের আলোচনা তো শুধু গণনা নয়, সংক্ষিপ্তকরণ নয়। এমন কি অনেক ভালো ভালো বই দেখলে রাখলেও নয়, তাই কোনো কোনো শিল্পের সমালোচকের লেখায় মেলে না সেই সচেতনতা, সেই বোধ, সেই দৃষ্টি যাতে বোঝা যায় কেন কোনো শিল্পী কোথাও চোখ রাখেন বা রাখেন না। এবং শিল্পী শুধু কারিগর নন।

যে কোনো শিল্পীর মতো যামিনী রায়কেও মুখ ফেরাতে হয়েছে অতিদক্ষ কিন্তু উৎকেন্দ্রিক প্রতিকৃতির জগৎ থেকে, জীবনের অনেক প্রত্যক্ষ দিক থেকে। নিশ্চয়ই তাঁর শিল্পীস্বভাবকেও মনস্থির করতে হয়েছে, অনেক রকম নৈপুণ্যের লোভ ত্যাগ করতে হয়েছে। একদিকে শিল্পের ঐতিহাসিক স্বকীয় বিকাশের ফলে আধুনিক শিল্পের শুদ্ধ ধ্যানধারণা এবং অন্যদিকে বৃহত্তর জীবনের ঐতিহাসিক প্রগতির ফলে সামাজিক বাস্তববাদের বিষয়মাহাত্ম্য, এই দুটি সমুদ্রের মধ্যে সেতু বিস্তারে কোনো একটি শিল্পীর কীর্তি আজও উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে নি। কারণ রূপের ধারণার অস্পষ্টতা যামিনী রায়ের তথা আধুনিক শিল্পের স্বভাববিরোধী, তাই যেখানে আমাদের অসম্পূর্ণ অসমঞ্জ জীবনের স্পষ্ট সঙ্গত চেহারা ফোটেনি, সেখানে তিনি চোখ রাখতে চাননি, এমনকি জীবনের অনেক কিছুর বাস্তব আকর্ষণ সত্ত্বেও। বিশ্ব-বিরাজের চটকে উদ্‌ভ্রান্ত না হয়ে বিশেষ দেশের বিশেষ যুগের সীমার মরুভূমিতে তিনি অর্জন করেছেন স্বকীয় বলিষ্ঠতায় শিল্পসীমার স্নিগ্ধ রেখা, সঙ্গত বর্ণালি। তিনি স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বিকাশের মাটিতে সীতার গণ্ডী ছেড়ে ছোটেন নি, কারণ তাঁর চিত্রের বিস্তৃত জগতের সীমায়নের ইতিহাস আমাদের এলোমেলো জীবনেরই মর্মে। তাই তাঁর অসামান্য বিকাশে আমরা দেখতে পাই শহুরে উপনিবেশের দুস্থ গ্রামীন ইতিহাসের সংগ্রাম ও জয়পরাজয়; তাঁর স্তব্ধ নিরুদ্ধ সৌন্দর্যের তীব্র বেদনা যার স্থিতধী রূপাভাসে জাগে ঐ ইতিহাসের স্বরূপেই দর্শকের জিজ্ঞাসা, স্পষ্ট রূপদানের আবেগ। তিনিই দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে

মনস্থির ক'রে কাজ করেছেন ও করছেন, মিলিয়েছেন অক্লান্ত প্রতিভায় একটি সৎসঙ্কল্প যার ছন্দ তাঁর বিরাট বিকাশ জুড়ে। জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছেন এক মৌল মানবিকতায়, এক দেশজ অন্তরঙ্গতায়। এ কথা না বুঝলে চিত্রকলার আলোচনা বাহ্যমাত্র। আর ইতিহাসের দায়িত্ব আমাদের সবার, যে যার কর্মক্ষেত্রে সারা দেশবাসীর, একা শিল্পীর নয়, সাহিত্যিকের নয়।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

কলকাতার এক থিএটারে কথাটা উঠেছিল। প্রবীণ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সস্ত্রীক "রক্তকরবী" দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, রক্তকরবী পাঠের চেয়ে অভিনয় দেখতে আরো ভাল লাগে। ঐ ভালো লাগার কৃতিত্ব শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী সম্প্রদায়ের। সুন্দর ভাব ও ভাষা সত্ত্বেও নাটকটিতে যে নাট্যগুণের অভাব বিদেশী পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল, সে অভাব পূরণ করেছেন প্রযোজক ও নটনটীরা, তাঁদের নিজেদের প্রাণময়তা দিয়ে, তাঁদের আবেগবান বাস্তবনির্ভর রূপায়নের আধুনিকতা দিয়ে। ফলে অধ্যাপকদম্পতি হলডেন-রা, তাঁদের নিমন্ত্রণ-কর্তা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শ্রীমতী মহলানবিশের মতোই খুশি হয়েছিলেন, বাংলাতেই অভিনয় দেখেশুনে। পরে হলডেন্ বলেছিলেন যে তিনি অবশ্য বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবিষয়ে আমরা কি ভাবি তা জানেন। ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্ররচনাবলী তিনি মন দিয়েই পড়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মহাকবি সেটা তাঁর পক্ষে বোঝা শক্ত হত, যদি না তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী দেখবার সুযোগ পেতেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখবার পরে তিনি কল্পনা করতে পারেন যে নিজভাষায় এই মহাপুরুষ, যাঁর হাত থেকে এইসব ছবি বেরিয়েছে, মহৎ কবি বলে বিবেচিত হতে পারেন।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর অনুবাদ-ভাগ্য ভালো হয় নি। এবং যাঁরা বাংলার ভূমিতে রবীন্দ্রকীর্তির মাহাত্ম্য জানেন না, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রচিত্রাবলী রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম ও প্রত্যক্ষ পরিচায়ক হিসাবে তাই সার্থক। রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা তাঁর শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপে এবং তাঁর বহুধাপ্রকাশে সম্পূর্ণতা এনেছিল। এই ব্যক্তিস্বরূপ স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে বিরাট এবং কীর্তিতে বীরগৌরবান্বিত, যদিচ তার প্রকৃতি বোঝা শক্ত তাঁর স্বদেশে ও স্বজাতির পৌর্বাপর্য বিচার ছাড়া। অবশ্য তাঁর বিস্তারের মহাসাগরকে রূপ-নির্ণয়ে বলতে হয় প্রশান্তই। একথা

স্বাজাত্যাভিমানেও না মেনে লাভ নেই যে রবীন্দ্ররচনাবলীতে একটি সবল মার্জিত মনের পরিচয়টাই মুখ্য, সে মনে ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির মর্যাদাই বেশি। কিন্তু এই ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির টান, তাঁর পরবর্তীদের যাই হোক তাঁর কাছে মোটেই একটা অগভীর অভ্যাস ছিল না। এই অমৃতের বিশ্বাস ছিল তাঁর সমগ্র স্বভাবের গভীরে, এই বিশ্বাস তাঁর কাছে একান্ত সত্য ছিল, এতেই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের আর মানসের মহিমা।

তাঁর বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার, বা যা তিনি তাঁর জীবনের ভিত্তিতে নিজেই গড়েছিলেন তাঁর সেই ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর সরকারী জীবনীকার আমাদের দুচার কথা যা বলেছেন তাতেই তাঁর পটভূমি খানিকটা আলোকিত: যেমন আমরা প্রভাতবাবুর জীবনীতে জানতে পারি যে তরুণ কবি ইওরোপে মানব-মনের স্বাধীন উল্লাসে যখন সমধিক মুগ্ধ হলেন, তাঁর ঋষি-প্রতিম পিতৃদেব তখন তাঁকে বাড়ি ফিরে আসতে বলেন। রবীন্দ্রনাথকে যে হঠাৎ বিবাহে বদ্ধ হতে হয়, সেও প্রভাতবাবু বলেন, তাঁর গুরুজনের উদ্বিগ্ন নির্বন্ধে। কী চিরজাগ্রত মর্যাদায় এবং সম্পূর্ণ কর্তব্যবোধের আবেগে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে জীবনের সব দাবিদাওয়া পালন করে যান, তাও আমাদের সবার জানা। কনিষ্ঠপুত্রের উপরে মহর্ষির প্রভাব খুবই গভীর ছিল, এই আধ্যাত্মিক সৌকুমার্যে এবং শালীনতায় বা নীতিনিষ্ঠায়।

অবশ্য যে কোনো ভালো জিনিসের মতোই এই সৌকুমার্য ও শালীনতারও একটা সীমাবদ্ধ দিক ছিল। রমঁ্যা রলঁ্যার পাঠকদের একটি গল্প এ প্রসঙ্গে মনে থাকতে পারে: একদা মহর্ষি দর্শনেচ্ছু রামকৃষ্ণকে বাড়ীর উৎসবে নিমন্ত্রণ করেন এবং তারপরে মনে করেন যে সুসজ্জিত বাবু-সাহেব অতিথিদের মধ্যে সেই গ্রাম্যবেশ সরল ধর্ম-সাধককে হংস-মধ্যে বকের মতো লাগবে এবং নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

রলঁার এই গল্পটিতে আভিজাত্যের যে বাধাবিপত্তি দেখা যায়, তার থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্তি পান নি। ভিলিএর দ লিল আদাঁর মতো

রবীন্দ্রনাথকে কখনো অত্যুক্তি করতে হয়নি যে : জীবনযাত্রা, ওটা আমাদের চাকরবাকররাই করবে। কিন্তু আভিজাত্য যে দেশে দুর্লভ ও প্রায়ই পঙ্গু, সে দেশে প্রকৃত অভিজাত হওয়ার সঙ্কোচ বাধা তাঁকেও ভুগতে হয়েছিল। এই বাধার মধ্যে দিয়ে তিনি অনেক কিছু লাভ করেছিলেন, মহৎ শিল্পীমাত্রেই যেমন স্বকীয় সীমার বা নির্দিষ্টতার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। সম্ভবত তাঁর সৃষ্টিময় কল্পনার চিরবিশ্রামহীন প্রাণশক্তিও এই স্থূল ভাঙাচোরা আমাদের জীবনের সাধারণ্য থেকে আত্মসম্বরণেই তার বিরোধী জোর পেয়েছিল। অবশ্য, তিনি সারাজীবন ধরে বারবার সীমানার বাইরে যাবার চেষ্টা করেছেন। এবার ফিরাও মোরে, এই আবেদন বসুন্ধরাকে তিনি বারবার বলেছেন কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে নাটকে নানাভাবে এবং তাঁর বিশাল কর্মক্ষেত্রের অন্তত দুটি বিভাগে তিনি তাঁর মহৎ কিন্তু নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারের গণ্ডী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেন। যখন জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি নিজে সম্পূর্ণতা পেলেন পরিণত বয়সের প্রশান্তিতে এবং দীর্ঘ কৃতিত্বের সাবলীলতায়, তখনই তাঁর অসামান্য গীত-প্রতিভায় এল দৃশ্য স্পৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বহির্বিশ্বের আর মানবিক প্রেমের সৌন্দর্যের মধ্যে সহজ আত্মদানের বিহ্বল সৌন্দর্যবোধ।

তাঁর গানের এই পরিণতি বা রূপান্তরের রহস্য ঠিক প্রশান্তির মধ্যে স্মৃতিধৃত আবেগের ব্যাপার নয়, এখানে আমরা যেন পাই এই স্থূল মর্ত্যলোকে আমাদের বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার দুঃখসুখ আনন্দবেদনাই, স্মৃতির নির্বিকার পূজার মধ্যে দিয়ে গ্রহণীয় রূপে। তাই কি চেহারায় চিরসুশ্রী রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সেই হয়ে উঠলেন আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ? সে সৌন্দর্য তো এক অসামান্য কবিমনের অসামান্য বিকাশের ঐশ্বর্যরূপই।

॥ ২ ॥

বহুকাল আগে এক আর্টস্কুল-অধ্যক্ষ বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তো একটা দেশলাইবাক্স আঁকতে পারেন না, তাঁকে কি করে চিত্রকর বলা যায়? কথাটা হয়তো আকাডেমিক দিক দিয়ে একেবারে উদ্ভট নয়;

বিশেষত যখন এদেশে বহু নবীন শিল্পী, যাকে বলে আবস্ট্রাক্ট আর্ট, তার স্বাধীন বিন্যাসে মেতে যান, যদিও ঐ আবস্ট্রাক্ট আর্ট ইওরোপের বুর্জোয়া রেনেসান্সেরই আবশ্যিক প্রতিক্রিয়া বা পরবর্তী ধাপ। সেজানের বিষয়েও এবম্বিধ কথা শোনা যেত, কারণ ধ্রুপদী ইতালীয় বা ওলন্দাজ ওস্তাদের মতো তুলি ব্যবহার এবং রঙের মসৃণ প্রয়োগ সেজানের কাজে দুষ্প্রাপ্য। গোগ্যাঁ ও দুওনিএর রুসোকেও শখের চিত্রকর বলা যায়। কাব্য বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কেন জানি না আমরা দেশলাইবাক্স বর্ণনার ক্ষমতা দাবী করি না—একেবারে করি না বললে ঠিক হবে না, অন্তত ঠিক ছবি-আঁকার মতো করি না।

সে যাই হোক, আরেকজন আর্টস্কুল-অধ্যক্ষ এ আপত্তির জবাব দেন। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই ড্রইং অভ্যাস করতেন। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের চিত্রলোকে আবির্ভাবের ব্যাখ্যায় বলেন যে তাঁর চিত্রের জন্ম রচনাখসড়ার কাটাকুটিতে তাঁর লিপি-রেখার প্রতি সার্থকতার বা শ্রী-র সন্ধানে মনোযোগে। সম্ভবত এও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শতাব্দী সাবালক হওয়ার আগে ছবি আঁকেন নি কারণ ততদিন একালের আবহাওয়ার অপেক্ষা ছিল। তিনি একালের শিল্পী তাই তাঁকে ষাটবছর অবধি একালের অপেক্ষা করতে হল এবং তারপরে তাঁর ছবি আঁকা চলল আবিষ্কারের আনন্দিত প্রাবল্যে। রবীন্দ্রচিত্রাবলী রবীন্দ্র-নাথের জীবন ও কীর্তির এবং আমাদের শিল্পের ইতিহাসে উভয়তই গভীর মনোযোগের দাবী রাখে।

লেওনার্দো বোধ হয় কাব্যের তুলনায় চিত্র যে আরো সন্তোষ-জনক শিল্প সে কথা ঠিকই বলেছিলেন, কারণ, "প্রকৃতির অফুরন্ত রচনাবলী অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে ও প্রচুরভাবে বুঝতে গেলে মানবমনের বাতায়ন অর্থাৎ চোখের মাধ্যমই প্রধান এবং কান হচ্ছে দ্বিতীয়, যার মর্যাদা আসে চোখে যা দৃশ্য তারই ধ্বনি শুনতে পেরে।" রবীন্দ্রনাথ মনে হয় ধ্বনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, তিনি যে গায়ক ও সঙ্গীত-কার ছোটবেলা থেকেই ছিলেন, সেই সাধনাই তাঁর শ্রবণের সহায়

হয়েছিল। প্রকৃতির রচনা তিনি দেখেন শোনেন ভালোবাসেন, সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি এল তাঁর কথায় ও সুরে একাত্ম হাজার গানে। গানের এই সম্ভ্রান্ত অভ্যাস ছন্দের সাধনায় ও কর্তৃত্ব অর্জনে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বর্তমান লেখকের মনে আছে, একথায় তিনি খুশি হয়ে সায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, দাভিঞ্চির মত সত্ত্বেও বলতেই হবে তাঁর দীর্ঘ এবং বিচিত্র কাব্যের অভিজ্ঞতায়, পদ্যে ও গদ্যে তাঁর সেই শক্তি আয়ত্তে এসেছিল, যাতে মানুষ তার নিজের বোধ্য বিশ্বকে কাব্যে নির্বিশেষ নবসৃষ্টিতে, নব ধারণায় পুনঃসংগঠিত করতে পারে। এমনকি তাঁর কাব্যের বীজবপনে এই ধারণামূলক বা বুদ্ধিমূলক অভ্যাসের জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রকাব্যের জগৎ একদিকে সীমায়িত হয়েছিল, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়াধিক সাহায্য পেলেও; শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক ইতিহাসের প্রভাবে নয়।

লেওনার্দো কাব্যের কথা সঠিক মনে না রেখেই বলেছিলেন: মানবদেহের প্রতিপ্রকাশের ব্যাপারে কবির কর্ম এবং চিত্রকরের কর্মে সেই তফাত, যে প্রভেদ খণ্ডিত এবং অখণ্ড শরীরের মধ্যে। —তিনি কবিকে সঙ্গীতকারের সঙ্গে তুলনা করেন: কিন্তু কবি বহুস্বরের সুরবদ্ধ বিন্যাসে অক্ষম কারণ বহু কথা একসঙ্গে বলার ক্ষমতা তাঁর নেই, চিত্রকর যা করতে পারে তার ষড়ঙ্গ সুষমায়, যাতে সমগ্রের অংশগুলি একই সঙ্গে সক্রিয় এবং একই সময়ে সমগ্রে ও অংশে দৃশ্য হয়ে ওঠে। ইত্যাকার কারণে কবির স্থান চিত্রকরের অনেক নিচে গোচর বস্তুর প্রতিপ্রকাশে এবং সঙ্গীতকারেব অনেক নিচে অগোচর বস্তুর ক্ষেত্রে।

প্রক্রিয়াগুলি যে ভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটি শিল্পেই তার বিশিষ্ট কর্মকাণ্ডবশত বিশিষ্ট সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যা চোখের শিল্প তাতে যেমন কানের কাজ হয় না, তেমনি যা মনের শিল্প তাতে যদি কেউ চোখের শিল্পের কাজ করতে যায় বা দাবি করে তাহলে তা তো ব্যর্থ হবেই। মানুষের অভিজ্ঞতার অনেক কিছু তাই চিত্রের আয়ত্তে নেই তার কর্মপ্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের জন্যই। "দিভিনা কমেদিয়া,"

"কিং লিআর" বা "অডিসি" কাব্যেই সম্ভব, লেওনার্দোর হাতে নয়। এবং কাব্যেও মালার্মের পর থেকে বস্তুর এক সংহত রূপের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। লেওনার্দোর পরের জ্ঞানে এও জানা কথা যে চিত্রকরের চোখও মানবদেহের খণ্ডিত রূপই একবারে দেখতে পায়, চোখের নিয়মই তাই; সমগ্রের অংশগুলি শিল্পীর সংযোজনা, একরকম গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। এমনকি দুই চোখ এক দেখে না। তবু লেওনার্দোর বক্তব্যে একটা অর্ধসত্য আছে এবং রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু কবি হতেন, তাহলে তাঁর গান ও ছবির ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হতুম এবং তাঁর শিল্পীসত্তাও তুলনায় অসম্পূর্ণ থাকত। গান ও ছবির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ, তাঁর কাব্যের কীর্তি ও সীমা মুক্তি পেয়েছিল।

পৃথিবীতে আরো দুচারজন মহাকবি ছবি এঁকেছেন, যেমন গয়টে বা হুগো এবং চিত্রশাস্ত্রে আলোক ও বর্ণতত্ত্বে গয়টের দান স্মরণীয়। পিকাসোর কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়! ইংরেজিতে ব্লেক আছেন একাধারে কবি ও চিত্রকর। কুমারস্বামী রবীন্দ্র-ব্লেক তুলনা করেছিলেন কিন্তু ঠিক মর্মে প্রবেশ করেননি, ব্লেকের ছবি ও কবিতা একে অন্যের রূপান্তর মাত্র, রবীন্দ্রনাথের ছবি কবিতার সম্পূরক।

আবার, যদিও রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় এমেচ্যর বা শখের কর্মী (কবিতাতেও কি তিনি তাই নন? কোনো কবিতার স্কুলে তো তিনি পাশ করে নি!) তবু তিনি এলফ্রেড ওআলিস্ বা রামজোড়ের সঙ্গে তুলনায় নন কারণ তাঁর চিত্রকলার ভিতে ছিল এক বিদগ্ধ সভ্যতার সজ্ঞান উত্তরাধিকারী বিশ্বজ্ঞ ভারতীয়ের ষাটবছরব্যাপী শিল্পসংস্কৃতির একনিষ্ঠ চর্চা। তবে এই দৃশ্য বিশ্বের আক্রম এবং সে বিশ্বকে রূপ দেবার নবাবিষ্কৃত ক্ষমতায় তাঁর উল্লাস প্রচণ্ড এবং ছবি আঁকা ব্যাপারটা পরিণতবয়স আমাদের শুভ্রকেশ কবিকর্তার কাছে শিশুর মতোই একটা উত্তেজনার অভিযান হয়ে উঠেছিল। শ্রীযুক্ত যামিনী রায় যখন তাঁর ছবির প্রশংসা করেন তাই তখন তিনি অত খুশি হন:

"আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং

অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের এই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।"

আর এক চিঠিতে তিনি লেখেন: "ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এইজন্যে তার একটি অহেতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি—সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশি হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম—কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়ত, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত।

এই হ'ল ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নেই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিস সে আমাদের দেয়—না দেখে থাকতে পারিনে; তাতে খুসী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে—নানা রকম ছাপ পড়েছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোনো একটা বিশেষত্ববশত—তা সুন্দর হোক বা না হোক মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিষ জেগে উঠছে। সে কোন তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি—এই অনুভূতিকেও কোনো একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি —এ প্রশ্নের উত্তর এই যে—সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, ততই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালোমন্দের আর কোনো রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু সে অবান্তর—অর্থাৎ যদি সে কোনো

নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মন টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখবার আনন্দ এর মর্ম-কথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন ব'লে আমার বোধ হয় নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানাকাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখাবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে "অয়ম্ অহম্ ভো" —এই যে আমি এই।"

যখন তিনি আগের পঁচাত্তর বছরকে পিছনে ফেলে আবার এক নতুন আরোগ্যের যাত্রায় চলেছেন, ভাঙাছন্দে অনিশ্চিত নতুন ভাষায়, সেই শেষ বয়সের কবিতার একটিতে দেখি:

"এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে—

কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশ্য,
কোথাও বা যৌবনের কুসুমপ্রগলভ বনপথ,
কোথাও বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত
মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।

সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সঙ্গীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই।
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।

তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার
বাণীবিলাসীর কানে ব্যাপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার ॥”

অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ছন্দ অনেক ভালো আত্ম-উপলব্ধি

করেছিল, কথা বা কাব্য সাহিত্যের অভ্যস্ত শুচিবায়ু তাঁকে "চণ্ডালিকায়" ব্যাহত করতে পারে নি, চিত্রকলায় প্রাচীরসীমা টানতে পারে নি। ১৯৩০-এ তিনি লণ্ডনে বলেছিলেন: "আমার মনে হল যে সমস্ত বিশ্বই জীবনের ও সৃষ্টির ঐক্যের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। কবির বা শিল্পীর সেইসব সৃষ্টিরই স্থায়িত্বের অধিকার আছে, যা সামঞ্জস্যে সঙ্গত, কারণ পারস্পরিক সম্বন্ধ-যোজনই সৃষ্টির নিয়ম। আমি মাঝে মাঝে ভাবি জিরাফের লম্বা গলাটার কি সার্থকতা। যখন ঐ গলাটার জন্যে অতিরিক্ত দাবিটা উঠল, নিশ্চয়ই সারা শরীর বিড়ম্বিত হল, এবং যতদিন না প্রক্রিয়াটা শেষ হল ততদিন নিশ্চয়ই সেটা খাপ খায় নি, তাই সমস্ত শরীরটাকে সচেষ্ট হতে হল আগন্তুককে যথোপযুক্তভাবে বরণ করবার প্রস্তুতিতে। এরকম ব্যাপার বিশ্ব ব্যেপে চলেছে।"

চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বস্তুর চরম ঈসথেটিক বা সংবেদন-উপযোগ উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সে তুলনায় কাব্যে তাঁর সৌন্দর্যের মান ছিল গোঁড়া ধরনের। সাহিত্যে বারবার চেষ্টা করলেও সমগ্র বিচারে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বে ও প্রয়োগে সুন্দরকে চিনেছিলেন তন্বু, পেলব, মার্জিত, আধ্যাত্মিক, একটু অভিজাতমন্য, একটু টেনিসনীয় ভাবে। সজনেডাঁটার আপত্তি তিনি কাব্যে তুলেছিলেন. কিন্তু চিত্রে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, "উট কিম্ভুত জানোয়ার, কিন্তু মরুভূমিতে নিজ পারিপার্শ্বিকে, উটও সম্পূর্ণতা পায়।" কবিতার চেয়ে ছবিতে বস্তুর নিজ পারিপার্শ্বিক দেখা ও রচনা করা আরো সহজ; যদিও অবশ্য রিল্‌কে বা পাস্তেরনাকের মতো আধুনিকদের কবিতাতেও সে চেষ্টা দেখা যায়।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের দুহাজার না হোক বেশ কিছু ছবি যেই দেখেছে সেই অভিভূত হয়েছে এক মহাকবির এই বিশ্বরূপদর্শনের স্বকীয়তায় ও বৈচিত্র্যে। এ এক আশ্চর্য নির্ভীক বিশ্ব, এক প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের নিবিড় ঐশ্বর্যে বিস্ময়কর জগৎ। এ জগতে বস্তুর প্রকাশ বহুরূপে

অন্তহীন, কখনো বা বস্তুর সুকুমার পেলব প্রায় মেয়েলি লালিত্য, কখনো বা সরল বস্তু, সন্ত্রাসের বা দুঃস্বপ্নের বিশ্বের বস্তু বা সূক্ষ্ম কল্পলীল বস্তু। মনের এ চিত্রলোকে নানা মেজাজ, গতির ও স্তব্ধতার আনন্দের ভাব, তীব্র অভীপ্সা, কঠিন উপহাস, তীক্ষ্ণ ঠাট্টা, স্নিগ্ধ মমতা। এবং প্রায় সর্বদা হাত অভ্রান্তটানে নিশ্চিত। বেগবান রেখার সৌন্দর্য যেমন দুঃসাহসিক তেমনি অনিবার্য, যদিচ প্রেরণা অনেক সময়েই পরীক্ষামূলক; এমনকি স্থির পাহাড়ের বা শান্ত মুনিমূর্তির ছবিতেও মনে হয় প্রচণ্ড বেগ যেন তলে তলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এবং অধিকাংশ ছবিতে রঙের ব্যবহার যেমন ব্যঞ্জনাঢ্য তেমনি নবনবউন্মেষশালী। রবীন্দ্রনাথ কলম তুলি বা আঙুল প্রয়োগ করতেন সমান ও পূর্ণ স্বাধীনতায়, নানা কালিতে এবং নানা জাতের রঙে। মনে আছে একদিন তিনি গল্প করতে করতে ছবি আঁকছিলেন, চেয়ারটিতে তিনি এবং বাইরের লোকটি সিল্কঢাকা বিছানায় সঙ্কুচিতভাবে বসে। রং ফুরিয়ে গেল, কিন্তু ছবির তাগিদ নয়; চামড়ার কাজের একশিশি রং এনে ছবি শেষ করলেন। দরকার হলে ফুলও চটকে তিনি ছবির রঙে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আঁকার পদ্ধতিও নানা, কখনো তিনি সরাসরি আঁকতেন একেবারে চূড়ান্তভাবে, কখনো বা অন্বেষী রেখাপাতে-পাতে। তাঁর ছবি দেখলেই এবং বিশেষ ক'রে, আঁকতে দেখলে বোঝা যেত যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের দীর্ঘ অভ্যাসে ও সিদ্ধিতে ছন্দের ও রূপের বোধ তাঁর কাছে প্রাথমিক হয়ে গিয়েছিল, স্নায়ুর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

বলা বাহুল্য, অভ্রান্ত চোখ ও হাতেরও দুর্বল মুহূর্ত আসে, মাঝে মাঝে ধ্যানের আর নির্মাণের মধ্যে অভিন্নতা কেটে যায়। তখন বিন্যাসরীতিতে বা ছবির মেজাজে খণ্ডিতভাব আসে। কিন্তু সেরকম কাজ গৌণ ও সংখ্যায় নগণ্য। ভালো ছবিগুলিতে, এবং সংখ্যায় তা বহু, দর্শকের চোখ খুশিতে ঘুরে বেড়ায় রেখার সঙ্গে সঙ্গে বা মুগ্ধ

হয়ে খুঁজে বেড়ায় রঙের বর্ণালি বা নানা দীপ্তি। এসব ছবিতে বোঝা যায় কিভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ কাটিয়ে গেছেন একপক্ষে মৃত আকাডেমিক বাস্তববাদের, যাতে প্রকৃতির পুনঃরূপায়ন নেই, আছে শুধু প্রতিরূপ ; এবং অন্যপক্ষে প্রাচ্যবাদী অধ্যাত্মবিলাসীদের নীরক্ত তনুতার। অবশ্য ভারতশিল্পের তথাকথিত প্রাচ্যধর্মী রেনেসান্সে রবীন্দ্রনাথেরও দান ছিল, অন্তত পরোক্ষে। এই ধারাই ছড়াল কলকাতা থেকে শান্তি-নিকেতনে, লক্ষ্ণৌ প্রয়াগ লাহোর মাদ্রাজ, সারা ভারতে। কিন্তু ফলেন পরিচীয়তে, পরে এই জীবনবিমুখ ভারতবাদী শিল্পের শিল্পমন্যতা এবং চিত্রগত দুর্বলতার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ তাঁর নিজেরই চিত্রাবলী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রলোক ভারতীয় মানুষের ও শিল্পীরই জগৎ—যদিও রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তায় সেই জীবনবিরোধী পরোক্ষতত্ত্বের চর্চা নেই, যে চর্চা আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর মতো পণ্ডিতব্যক্তি প্রচলিত করেন, বিশেষত তাঁর মরমীয়া বস্টনবাসী যুগে। পেশাদার ভারততাত্ত্বিকরা আজকাল এই ভারত-ব্যাখ্যা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। কিন্তু স্টেলা ক্রামরিশ্ বা অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপত্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্র-নাথের সত্তায় এই অলৌকিকতা নেই, তাঁর শিল্পদৃষ্টি এই রৌদ্রদীপ্ত গরমদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প, ভারতীয় ভাস্কর্যের দৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম। এ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বিশ্বের সব বস্তুই গ্রাহ্যই মনে করে, এমনকি বস্তুর সম্ভাব্য রূপও এই শিল্প বাদ দেয় নি তা সে মানবিক, জান্তব, উদ্ভিদ্ যে কোনো জগতের বস্তু হোক না কেন, সবই শিল্পরূপে প্রকাশ দিয়েছে এবং এই রূপায়ন একটা সভ্য জীবনের প্রতি মুক্তকল্প অথচ নিয়মানুগ মনোভাবে স্বচ্ছ।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক মানুষ ছিলেন, ভারতীয় কিন্তু আধুনিক জগতের ভারতীয়। যে মিথ বা পুরাণে সেকালের ভাস্করের কাজ করবার সহজ সুবিধা ছিল, সে মিথ আজ মৃত বা মুমূর্ষু এবং রবীন্দ্রনাথ চিত্রলোকে জীবনধর্মী বর্তমান ছেড়ে পুণ্য অতীতে যাবার কথা ভাবেন নি। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সুবিধা তিনি পান, ইওরোপের

বুর্জোয়া ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আধুনিক শিল্পীরা তা পান নি। ভারতবর্ষে রিয়ালিস্‌ম্‌ স্যুররেয়ালিস্‌ম্‌ প্রভৃতির সমস্যা অবান্তর। আমাদের কৈলাসভাবনায় বাস্তব কখনো রীতির বিন্যাসে আসতে ভয় পায় নি, আমাদের রিয়ালিস্‌ম্‌ ও আবষ্ট্রাক্ট রূপ অঙ্গাঙ্গী। প্রতীক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসঙ্গী এবং সাক্ষাৎ জীবনের প্রেম হাতে হাত দিয়ে চলেছে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সঙ্গে বিস্তৃত আততিতে ও শিথিল বন্ধনে।

এই ভারতীয় ভূমিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক শিল্পীর মানস আনলেন। মোদিল্লিআনি বা এমিল্‌ নল্‌ডে বা মাক্স এর্ণশ্‌ট্‌ রবীন্দ্র-মানসে আত্মীয় পেতেন যদিও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে টিউটনী উদ্দামতা বা উত্তরে রাত্রির দুঃস্বপ্নের বিলাস কিছুমাত্র নেই। ক্লে-র চারু অথচ ভয়াল কল্পক্রীড়ার খামখেয়ালিপনাও রবীন্দ্রনাথের চিত্রে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত, ক্লের জর্‌নাল পড়লে হয়তো রবীন্দ্রচিত্রের স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথও ক্লের মতো রেখার অভিযানে উৎসুক হয়ে থাকতেন: একটা ভৌগোলিক প্ল্যানের ভিত্তিতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির দেশে একটা অভিযান প্রস্তুত করা যাক। মৃত বিন্দুটিকে নাড়া দিতে হবে গতির প্রথম ক্রিয়া দ্বারা (রেখা)। একটু পরে নিশ্বাস নেবার জন্য থামো (ভাঙা রেখা, বারবার ছেদ দিয়ে স্পষ্টবাক্)। আরেকবার ফিরে তাকাও ইতিমধ্যে কতটা এলে (প্রতি-গতি)। মনে মনে বিবেচনা করো এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ঐ রাস্তাটা (রেখার একটা গোছা)। একটা নদী আমাদের বাধা হল; আমরা নৌকা নিলুম (তরঙ্গায়িত গতি)। একটু দূরে একটা সাঁকো রয়েছে (বঙ্কিম রেখার সমষ্টি)।

চিত্রলিপি ২-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও বলেছেন:

. Desultory lines obstruct the freedom of our vision with the inertia of their irrelevance. রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে দেখা যায় কেমন করে তিনি উদ্দেশ্যহীন রেখার অপ্রাসঙ্গিক জাড্য দূর

করে দৃষ্টিকে মুক্তি দেন। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই কিভাবে রেখাগুলি মুক্ত হল এবং তারপরে তাদের সচ্ছল জীবন-যাত্রা করতে লাগল; রঙের বিন্যাস তন্ময়ে হয়ে দেখি, অনচ্ছ গাঢ় বা ভাস্বর আলোকময়, তুলিতে আহত বা কলমে টানা বা আঙুলে ঘষা; কখনো তুলির আঘাত সরল কখনো বা ক্রমিক আক্রমণ। রেখার মুক্তি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে জর্মানদের মতোই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু জর্মানদের যা নেই রবীন্দ্রনাথের বহু ছবিতে বর্ণপরম্পরায় স্থানবোধের গভীরতা ও টোন বা রঙের আভার বিন্যাস স্পষ্ট দেখা যায়।

ছাপাছবিতে এই বর্ণচ্ছটার স্বরবিন্যাস বোঝা শক্ত তবুও পৃথ্বীশ নিয়োগী ও পুলিন সেনের যত্নে চিত্রলিপিতে খানিকটা রঙের আভাস এসেছে। অবশ্য খুব ভাল ছাপাতেও রঙের অতিসূক্ষ্ম আভার খেলা আনা শক্ত, যেমন রবীন্দ্রনাথের মস্কোতে আঁকা ছবিটিতে নীল ও কালো এবং বেগনির যে বর্ণিকাভঙ্গ আছে (ইন্দো-সোভিএত সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্যোগ সত্ত্বেও) তা ছাপাতে ঠিক আসেনি। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছবিতে, যেমন এই সোভিএত-বিষয়ক চিত্রটিতে রঙের খোল বা জমি ছাপায় সবটা না খুললেও ছবির গঠনটি ছাপাতেও গৌণ হয় না। আবার কোনো ছবিতে রংই মুখ্য। সেটা নির্ভর করে বৃদ্ধ কবির জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে তার উপরে, কখনো একক, কখনো একাধিকের সংযোজনায়, সবসময়েই ছন্দের অমোঘ কিন্তু স্বাধীন ন্যায়নিষ্ঠায়, রেখা-নির্ভর বা বর্ণময় বা দুইই একত্রে।

রবীন্দ্রচিত্রাবলীর বৈচিত্র্যের জন্যেই তার সরাসরি ভাগ করা শক্ত। ক্রমবিকাশের দিক থেকে হয়তো একটা ভাগ সম্ভব: বিশ দশকের ছবিগুলি প্রায় লিপির বিপদআপদের ভিত্তিতে রচিত নক্সা বা প্যাটার্ণ, কাটাকুটি থেকে সেগুলির আরম্ভ, পরিণতি নিছক শিল্পরচনার মজায়। পরের ছবিগুলি শুদ্ধ চিত্রময়। তার কিছু সাক্ষাৎ জীবনানুগ, কিছু আলেখ্য, নানান লোকের, নিজের এবং ঐতিহাসিক মানুষেরও, যেমন

দান্তের। আরেক ভাগে দেখা যায় ফুল পাখি জীবজন্তু সব চলন্ত বা স্থির প্রাকৃত রূপের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের রূপের দিকে ঝোঁক, কিছুতে পাওয়া যায় রূপের অপ্রাকৃত বিন্যাসের দিকে মনোযোগ।

নানা দেশের নানা যুগের শিল্পের স্মৃতি জেগে ওঠে এই সব ছবি দেখে। আবার কিছু ছবিতে সে সব আকার বা রূপ দেখা যায়, তা জলেস্থলে কেউ দেখেনি, সে সব রূপ কবির অফুরন্ত কল্পনার স্বয়ম্বশ সৃষ্টি। রঙের সাহসী লেপে বা রেখায় বিস্তৃত বা রঙের পর্দায় আভার বিন্যাসে জহরতের মতো বা মোজেকের মতো জ্বলজ্বলে, দেয়ালির মতো প্রদীপ্ত অনেক সময়েই এ সব ছবিতে নীল বা কালোর ভিত্তিবর্ণে বা পশ্চাদপটে উজ্জ্বল রংগুলির প্রাণময়তা আজও অম্লান হয়ে আছে। রেখাবলিষ্ঠ এক বা বহুবর্ণ রবীন্দ্রচিত্রাবলী দেখে মনে হয় বাখের ফ্যুগের গভীর বৈচিত্র্যের প্রায় অতিমানবীয় সুষম গৌরবের কথা।

লোকশিল্প ও বাবুসমাজ

যাকে সাহেবরা বলতেন বাবু ভদ্রলোক, সেই উচ্চশিক্ষিত সমাজে একদা আমাদের গ্রামের মানুষের তৈরি সুন্দর জিনিষের কদর ছিল না। ছবির তো কথাই নেই, ইংরেজেতর সাহিত্যেরও সম্মান ছিল কম। পুতুল বা পূজাপার্বণ মেলায় সংসারে কাজে লাগে এমন সব সুন্দর জিনিষ অবহেলার বস্তু ছিল। অবশ্য সৌখীন বাবুরা, যাঁরা ঠিক সাহেব সাজতে পারতেন না, তাঁরা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার কাপড় পরতেন, শাল জামেয়ারও গায়ে দিতেন। কিন্তু দেশের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে শিক্ষিতের রুচির বিচ্ছেদটা ঘটে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাঠক মাত্রেইএ খবর জানেন। বরঞ্চ দু'চারজন ইংরেজের নজর পড়েছিল এদিকে এবং তার পরে কিছু পুরোধা বাঙালীদের। তাই এ গরম দেশের ধনীর বৈঠকখানায় ভিড় করে থাকত ইংলণ্ডের নকল আসবাবপত্র, ভিক্টোরীয় ইংরেজের কুরুচিকে দেশীভাবে অতিরঞ্জিত ক'রে। দেশজ গান বা গ্রাম্য নাচ তো শুধু রুচিতে নয় নীতিতেও বাধত। তবু গান কিছু প্রতিপত্তি পেয়েছিল, ভক্তির নিরাপদ আকর্ষণে। এবং এই ভক্তির আবেদনটা আবার আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রথম যুগে প্রবল সমর্থন পেয়েছিল।

নাচ কিন্তু খুবই নিন্দিত ছিল, নাচ ব্যাপারটাই এত শারীরিক, এত ভিক্টোরীয়-বিরোধী। ভিক্টোরীয় ইংরেজের মোটা গলার প্রভাবে শরীরের ও তার গতির সৌন্দর্যের বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত অগ্রজেরা ছিলেন সন্ত্রস্ত, বিশেষ করে যেহেতু তার বিপরীতে ছিল বাবুবিলাস।

আজকের দিনে আমরা খানিকটা বুঝতে পারছি এই মানসিক শীর্ণতার বড়ো কারণটা। আমাদের পিতৃপিতামহেরা ছিলেন ভারতের বলিদান ইতিহাসের বেদীতে। রামা মণ্ডল আর হাশিম শেখ শুধু নয়,

তাঁরাও হয়েছিলেন চাক্‌রী পেয়েও বিদেশী শাসন শোষণের শহাদ্, বিদেশীর অস্বাভাবিক প্রভাবে তাঁদের চৈতন্যে এসেছিল আত্মবিচ্ছেদ, নিজ বাসভূমে পরবাস। এর প্রতিবাদে যে শিক্ষিত জাতীয়তা জাগল, সে প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া মাত্রেরই প্রকৃতিগত কারণে ছিল আতিশয্যে এলোমেলো। ইতিহাসের যে স্বাভাবিক বেগে লিবারল সভ্যতা স্বাধীন ইংলণ্ডে নানান্ ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, সেই স্বাভাবিক বেগ না থাকায় আমাদের ভাঙন আমরা বাঁধতে পারি নি। পরস্বলোভীর নির্মম প্রতাপের ও প্রভাবের কাছে আমাদের ক্ষমতা একান্ত কণ্ঠগত ছিল। দেশের জীবনযাত্রার চাবি ছিল দেশের বাইরে, তাই দেশ রয়ে গেল যাকে বলে ব্যাকওআর্ড দুর্গত। শহর গড়ল অনুপাতে কম; যা হল তাও হল অপ্রকৃতিস্থভাবে, জাতীয় জীবনের বিকাশের তালে নয়; ফলে শহর-গ্রাম জোড় বাঁধা চল্‌ল না, গ্রামও হল অসুস্থ।

আজও দেশে এমন লোক আছেন যাঁরা সত্যিই এই দুর্গত দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিষয়ে মনস্থির করতে পারেন না, কেউবা দূর-থেকে-দেখার উপর-থেকে শোনার বদান্য কৌতূহল নিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক আধ সন্ধ্যা কাটিয়ে যান। তার চেয়ে বেশি কাটানোও শক্ত, কারণ দুয়ের মধ্যে ঘরদোর খাওয়াপরা জীবনযাত্রার সব কিছুতেই ফারাকটা দুস্তর। আবার কেউ কেউ গ্রাম্যশিল্পীর পৃষ্ঠপোষণ করে থাকেন, যেমন ফ্যাশনেবল্ সমাজের মহিলা সমাজকর্ম ব'লে হৃদয়হীনতার চরম প্রকাশ দেন তাঁদের মহিলা রক্ষা সঙ্ঘে বা নারী সেবা সমিতিতে। তাতে না থাকে শ্রদ্ধা না থাকে মমতা, ফলে উভয় পক্ষে কারোই লাভ হয় না—এক ব্যবসার দিক থেকে ছাড়া, এবং শিল্পের মুরুব্বি হওয়া ছাড়া। শোনা যায়, সমুদ্রপারের উদ্যোগী পুরুষরা এই লোকশিল্প ব্যবসায় সম্প্রতি সমধিক মন দিয়েছেন এদেশী সহকর্মী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে।

এতে লোকশিল্পের ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। অন্যথাও থাকতে বাধ্য, কারণ বর্তমান সমাজজীবনে সেই সাবেক বিন্যাস নেই বা থাকতে পারে না, যাতে লৌকিক সংস্কৃতি সাবেকী রীতিতে

বিকাশ পেতে পারে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সে পরিবর্তনের স্বরূপ মৌলিক। তবু, আপাতত এই পৃষ্ঠপোষকদের কল্যাণে যদি শাড়ী বা জামার নক্সা সুন্দর হয়, বা অন্যান্য সুন্দর জিনিষ ড্রয়িংরুমের শোভা বৃদ্ধি করে সেও ভালো। কারুশিল্পীদের কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্যও এতে হয়—যদিও রুচির ও হাতের অবনতির দিকটা নগণ্য নয়। যাই হোক্, আজ যদি বৈঠকখানায় আত্মীয়স্বজন বা সিনেমা স্টারের ফোটোর মধ্যে দু'চারখানা মাটি বা কাঠ বা কাপড় বা বেতের কাজের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়, তাহলে অবজ্ঞা বা রাগ না করে অচিরে রুচির সম্পূর্ণতাই আশা করা যাক্।

সত্যিই তো এই রুচির সমস্যা বিরাট সমস্যা। ভঙ্গুর সমাজে তথাকথিত মার্কিন বা বোম্বাই ফিল্মের প্রভাবেই হোক্ বা কিছুটা রেডিও-র মাহাত্ম্যেই হোক্, রুচির অধঃপতন আমাদের দেশে ভয়াবহ। মাইকের জ্বালায় বর্তমানের যন্ত্রণার কথা ছেড়ে দিলেও, ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। এই কুশ্রী গান ও বীভৎস অঙ্গসঞ্চালনের প্রভাব শুধু নয়, এই যে শব্দের প্রাবল্য বা গোলমালের নেশা এতে মনের অভ্যাস বদ্‌লে যায়, স্নায়ুতে এমন জট পাকায়, যে সূক্ষ্ম সুকুমার কিছু আর মনকে স্পর্শ করে না, স্তব্ধতার যে সমুদ্রে শিল্পকার্যের তরঙ্গ-ভঙ্গ সম্ভব, মনের সে সমুদ্র আজকের ছেলে-মেয়েরা আর চিনতে পারবে না বলেই ভয় হয়। অন্য-পক্ষে আবার ন্যাকামিকেই মনে হয় সংস্কৃতির আত্মরক্ষার পথ। ফলে ন্যাকামির মাধ্যমে নানা রীতির দোআঁশলা খিচুড়ি বানিয়ে সংস্কৃতি ব্যবসাও জমে উঠেছে। শুধু বয়স্ক-জগতে নয়, শিশুদের নিয়েও। তাই তো রবীন্দ্রনাথ হয়ে যান নাটকের রবুদাদা, অবনীন্দ্রনাথ হয়ে যান অবন-পটুয়া। তাই তো কার্পেটের পাশে আজকাল মার্বেল মেজেতে আল্‌পনা আঁকা হয়। সঙ্গতের একতান বাজনা হয়ে ওঠে মার্কিন কায়দার দেশী ভাষ্যে বীভৎস।

আশার কথা ক্রমে ক্রমে অনেকে এ বিষয়ে সজাগ হচ্ছেন। সুরুচির অভিযান অবশ্য মন্থর, কারণ স্বকীয় স্বাভাবিক রুচির বিকাশ অনুকূল

অবস্থাতেও সময়সাপেক্ষ। এই রুচির বিকাশে আমাদের লোক-শিল্পের ভূমিকা গৌণ নয়। তার মজ্জাগত রূপবোধের দ্বারা, তার বিন্যাসবুদ্ধি, তার নিহিত সামঞ্জস্যের দ্বারা আমাদের লোক-শিল্প এই রুচির অভিযানে আজও নেতৃত্ব নিতে পারে। এই রূপবোধ বা বিন্যাস-শক্তি সম্ভব হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে ফাংকশনাল বা বাস্তব প্রয়োগের বা উপলক্ষ্যমূলক কাজের প্রেরণায় ও অভ্যাসে। এর পিছনে ছিল একটি সমাজ-জীবনের সংহতি, শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও। এই সমাজ-জীবন ইংরেজ শাসনের বিরাট চাপেও একেবারে মরেনি, কারণ সাম্রাজ্যের ও ব্যবসার স্বার্থেই আমাদের গ্রামে গ্রামে ইংরেজ শহরের স্বল্প সুখ-সুবিধাও আনতে যায় নি।

অবশ্য এই সমাজ জীবনও আক্রান্ত এবং সে নিয়ে হাহুতাশ ক'রে লাভ নেই। কারণ বর্তমান জগতে যন্ত্রসভ্যতার সুযোগ-সুবিধা সকলেরই প্রাথমিক দাবী। সমাজজীবনের প্রাচীন গ্রাম্য বিন্যাস আজ অনিবার্য ভাবে বদলাতে চাইছে, নতুন জীবনের নতুন বিন্যাসে। কিন্তু সংস্কৃতির দান সমাজজাত হলেও শিল্পকর্ম বলেই কিছুটা উদ্বৃত্ত থেকে যায় এবং আমাদের সংস্কৃতি একেবারে মৃত নয় বলেই তার সাহায্যে আমাদের অনেক অপচয় থেকে বাঁচাতে পারে। তখন এই নতুন জীবনের রসায়নে পুরানো অভ্যাস প্রাণ পাবে সচেতন নির্বাচনে, আমরা মুষ্টিমেয় উচ্চ বা অর্ধ শিক্ষিতেরা বেঁচে যাব দেশের অধিকাংশের শিল্প-সংস্কৃতির বৃহৎ ধারায়। এখনও চেষ্টা করলে এই ফাটল সারানো যায়—জীবনের বা মনের দিক থেকে কম খরচে।

কিন্তু লোক সংস্কৃতির মূল্য আমরা যেন দিই নিজের গরজে, প্রাণের দায়ে; পৃষ্ঠপোষক, বা সংগ্রাহক বা নৃতাত্ত্বিক সেজে বা দেশ-বিদেশে ব্যবসার তাগিদে নয়। একই মহাদেশের মানবসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ আমরাও, শহুরে বুদ্ধিজীবী চাকুরিয়া লোকেরাও। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধের মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে পারি সম্পূর্ণতার পথে, নতুন জীবনের স্বাস্থ্যের পথে পেতে পারি মুক্তি। আর আমাদের

সাধারণ মানুষেরা ? তাদের ক্ষমা তো আমরা সবাই জানি, তাদের অসন্দিগ্ধ মহত্ত্বেই তো আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি।

লোক-সংস্কৃতির চিন্তায় যেন আমরা না ভাবি যে আমাদের অন্তরীণ দেশবাসীরা—আদিম বা অন্ত্যজ মানুষেরা আমাদের হাতে তৈরী রক্ষা কবচের মুখাপেক্ষী। যে সুযোগ-সুবিধা আমরা ভোগ করি, তার থেকে আর কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। অধিকারের প্রশ্নও ওঠে না, কারণ খাওয়া-পরা চিকিৎসা শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ আজ নির্বিশেষে সবার কাছেই সম্ভাবনায় কাম্য। লৌকিক-সংস্কৃতির আকর্ষণ যেন জীবন্ত মানুষকে আমাদের যাদুঘরের সামগ্রী না করে' তোলে।

সব শিল্পকর্মের মধ্যে যেটা সবচেয়ে স্থাণু, কারণ সবচেয়ে অভ্যাসিক সেই লোকশিল্পও অমোঘভাবে পরিবর্তমান। পরিবর্তমান বিশ্বের হাল-চাল আমাদের শহুরে জীবনকে যেমন প্রভাবিত করছে, তেমনিই করছে লোক-শিল্পের সামাজিক আবহাওয়াও। এই যুগান্তরের একটি সাক্ষাৎ ফল হচ্ছে স্বভাবতই শিল্পোৎকর্ষের মানে অবনতি, রেখা হয়ে যাচ্ছে দুর্বল, রং হয়ে যাচ্ছে বিসদৃশ, বিন্যাস অসতর্ক। এ অবনতির সাক্ষাৎ কারণ অবশ্য শিল্পীদের জীবিকার দুর্দশা। বড়ো কারণ হচ্ছে, লোক-সংস্কৃতির সামাজিক সার্থকতা অর্থাৎ এর কারুশিল্পত্বই ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। এখন লোক-শিল্পের ব্যবহারিক সার্থকতা থাকছে ব্যবসায়িক এবং কোথাও কোথাও সরকারপুস্ট শিল্প বা বিলাসী খেয়ালের পণ্যসামগ্রী হিসাবে।

কিন্তু আমাদের বৃহত্তর আরেক বঙ্গ-ভঙ্গের দিক থেকে এখনও সময় হয়তো আছে। একদিকে হতভাগ্য আমরা যেমন বুর্জোয়া লিবারল পণ্য-বিপ্লবের ইংলণ্ডের মতো বড়ো রাস্তায় যেতে পাইনি, তেমনি আমাদের সাম্রাজ্যের অলি-গলিতে আনাগোনাই ভবিষ্যতের সহায় হতে পারে। হয়তো আমরা এরই জন্য আরেক বিশৃঙ্খলার ও পরের যন্ত্রণার দু'এক ধাপ ডিঙিয়ে যেতে পারি। উদাহরণত, আমাদের অতিকায় শহর—এবং জীর্ণ গ্রামের সম্বন্ধের সমস্যাটা কিঞ্চিৎ সহজে সমাধান হতে পারে।

সেই রকম ইওরোপের শিল্পে আরেক যে সমস্যা কাঁটার মতো বিঁধেছিল ও আজও বেঁধে, আমরা হয়তো যে রকম প্রশ্ন এড়াতে পারি আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাহায্যে। দৃষ্টান্ত ধরা যায়, রিয়ালিসম বা এবস্ট্রাক্ট আর্টের তর্ক। বাস্তববাদ বা পরোক্ষ শিল্পনীতির পশ্চিমা সমস্যা ভারতীয় জীবনে ও শিল্পসাহিত্যে লালিত যে কোনো সুস্থ ভারতীয়ের কাছে একটু অবাস্তব লাগে। কারণ আমাদের লৌকিক শিল্প-সাহিত্যে বাস্তবের বোধ এবং রীতিবিন্যস্ত প্রকাশ একই সঙ্গে চলেছে। আমাদের শিল্পের কনভেনশন্‌স বা রীতিনীতি পশ্চিম ইওরোপের পুনরাবৃত্তি নয়, জীবনের ও মানসের ভিন্ন অভ্যাসে তার ভিত্তি।

নবযুগ-নির্মাণে তাই আমাদের দেশজ সংস্কৃতি বৃহত্তর অর্থেই আমাদের সহায়। তার মানবিকতা আমাদের একটা বড়ো সম্পদ, কারণ এই লৌকিক জগতেই আমরা দেবদেবীর দৌরাত্ম্য থেকে নিজেদের কিছুটা বাঁচিয়েছি। তাছাড়া এই লৌকিক শিল্পের প্রাত্যহিক প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে নক্সার বা বিন্যাসের সৌন্দর্য খেলায় বা সামাজিক কাজে-কর্মে আমাদের চোখ-কাণ হাত-মনের অভ্যাসে রুচিকে বাঁচিয়েছে। এর সাহায্যে আমাদের কাজ অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন হতে পারে ঃ যে লোকশিল্পে আর সামাজিক সার্থকতা নেই, তার সাবেক প্রাণশক্তি থাকবে কি না! দেখতেই পাচ্ছি, বছরে বছরে কি রকম রুচি ও কলাকৌশলের অবনতি হচ্ছে। যখন মনের মাটিই জীর্ণ, তখন সে জীবনের মাটিতে যার শিকড়, সেই কারুশিল্প কি করে ফুলে ফলে ঐশ্বর্য বিস্তার করবে? এর বিধান সাবেককালে নয়, সাবেকী সমাধানেও নয়, অন্যত্র। এবং এই অবনতির জন্য শুধু লোকশিল্প-বিলাসীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বরং এই বিলাসীদের কল্যাণে যদি শিল্পীদের কিঞ্চিৎ সুরাহা হয় এবং বিলাসী বাবুদের আর তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের রুচির কিছু উপকার হয়, সেও মন্দের ভালো।

তাছাড়া এই পুরাণো কারু-কাজের রীতির মধ্যেই নতুন প্রাণ-সঞ্চার হতে পারে শিল্পীর মনে ও হাতে নবজীবনের তাগিদে। উদাহরণ স্বরূপ

ধরা যায় শ্রীযুক্ত বলাই পালের লক্ষ্মীর সরা। লক্ষ্মীর সরার সাবেক রূপ এই শিল্পীর হাতে শুধু নতুন বিষয়ের মর্যাদা পায়নি, শিল্পীর মনের আকৃতি তাঁর নতুন বিষয়ের রেখা ও রঙের প্রাণময়তাতেও প্রকাশিত।

অবশ্য কথা উঠতে পারে যে, কাঠের বা মাটির বা সোলার পুতুল, লক্ষ্মীর সরা বা কলস বা সুজনী বা কাপড়ে মৌলিক উপলক্ষ্যের সার্থকতা আর না থাকলেও খেলনা বা গৃহস্থের শোভা হিসাবে ব্যবহার্য বটে, কিন্তু নৃত্যের কি হবে? একথা সত্য যে লোক-নৃত্যের প্রেরণা ও প্রয়োগ অনেকখানি নির্ভর করে তার সামাজিক উপলক্ষ্যে। শহুরে মঞ্চের উপরে অনেক নৃত্যই মানায় না, অধিকন্তু দর্শকরা তার প্রেরণায় অংশ নিতে অক্ষম। তবু নৃত্যের সৌন্দর্য এই সৌখীন আবেদনেও কিছুটা থেকে যায়। অবশ্য কষ্ট করে গ্রামে গিয়ে নাচ দেখা তার চেয়ে বেশী সার্থক। কিন্তু শুধু সাময়িক আনন্দ ছাড়া আরেক দিক থেকে লোক-নৃত্যের সার্থকতা স্পষ্টতর সেটা হচ্ছে নৃত্যের রূপশিক্ষার দিক, নতুন নৃত্য প্রেরণায় যার প্রভাব কার্যকর হবে। বিশেষ করে আজ যখন আমরা জানি যে শিক্ষায় শরীরের ছন্দশিক্ষার মূল্য প্রাথমিক। এই ছন্দ শিক্ষায় আমরা যত বেশি লোকনৃত্য দেখতে পারি এবং স্থানকালপাত্র ভেদে এবং ক্ষমতানুসারে তার থেকে পাঠ নিতে পারি, ততই লাভ। তাছাড়া, আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন নিছক সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ পাব না?

কিন্তু এই লোক-নৃত্যেও বাইরের স্পর্শ লেগেছে, আর এখানেও যাদুঘরে একে রক্ষা করার চেষ্টা নিরর্থক। আমার মনে আছে এক আদিবাসী গ্রামে নাচ দেখতে গিয়ে আমার এক বিশেষজ্ঞ বন্ধু মর্মাহিত বোধ করেছিলেন, কারণ ছেলেরা সব শার্ট পরে বেরিয়ে এল এবং মেয়েরা জামা। বলাই বাহুল্য তাতে নাচের অনেকখানি পেশীসৌন্দর্য কমল। কিন্তু আমরাই যখন শরীর বিষয়ে লজ্জিত, তখন কি ক'রে এরাই বা শরীর বিষয়ে সুস্থ গর্ববোধ করবে? একই হাওয়া তো শহরে ও গ্রামে বয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞকে চিন্তিত দেখেছি, সর্বত্র বিজলী বাতি হলে,

আধুনিক চানের ঘর নালানর্দমা হলে, লোক-সংস্কৃতি কি হবে? তখনও লোকে নাচবে গাইবে গড়বে আঁকবে, বরং তখনই আরো স্বাধীনভাবে লোকের জীবনের আনন্দ প্রকাশ হবে—এ আশা আমাদের আছে। কারণ এই দেশেরই মানুষ তো আমরা, দেশের লোকের জীবনী শক্তির অমরতায় আমাদের আস্থা। আমি তো দেখেছি কি অত্যাচারে দুঃখ-কষ্টে জর্জর জীবনের মধ্যেও অক্লান্ত এই সাধারণ মানুষের নাচগান শিল্পের আনন্দ।

কয়েক শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও শোষণের দুর্ভাগা উত্তরাধিকারী আমরা, শহুরে তথাকথিত শিক্ষিতেরা এখনো নিজেদের বাঁচাতে পারি আমাদের দেশের লোকের নবজাগরণে যোগ দিয়ে। লোক-সংস্কৃতি নবজীবন পাবে জনসাধারণের সংস্কৃতিতে। তাতে যোগ দিয়ে সঙ্গগুণে মুক্তি আমাদেরও ভরসা।

যামিনী রায় ও শিল্পবিচার

শ্রীমান অশোক মিত্র আমার একান্ত স্নেহভাজন ও দীর্ঘকালের বন্ধু, তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সুমারির বিপুল কীর্তিতে আমিও অনেকের মতো মুগ্ধ এবং গর্বিত। শিল্পকলা সম্বন্ধে শ্রীমানের নানা রচনাও আমাকে বিস্মিত করেছে তাঁর অনলস উৎসাহ ও পাণ্ডিত্যের আরেক প্রমাণে। তাই শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের বিষয়ে 'পরিচয়'-পত্রে অশোকের দীর্ঘ আলোচনা পড়ে আমার মনে যে সব প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলি তাঁর কাছে বিনা সঙ্কোচে উপস্থিত করতে পারছি এবং যেহেতু আমার প্রশ্ন একজন সাধারণ বাঙালী মানুষের প্রশ্ন, যে মানুষ যামিনী রায়ের ছবি ভালোবাসে এবং বহুকাল ধরে নিয়মিত আনন্দে দেখে আসছে, তাই এই প্রশ্নগুলির সার্থকতা ব্যক্তিগত সমাধানের ব্যাপারের বাইরেও গণ্য অর্থাৎ প্রকাশ্য হতে পারে।

যামিনী রায় প্রবন্ধের সুর অশোকবাবু তাঁর প্রথম দুই প্যারাগ্রাফেই বেঁধে দিয়েছেন; বলেছেন: সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতোই, যামিনী রায় গড়ে দিয়েছেন আমাদের চিত্রশিল্পের ধ্যানধারণা। যার ফলে তিনি 'স্বদেশে স্বীকৃত' এবং সবদেশের শিল্পী ও সমঝদারের মনোযোগের পাত্র। তারপরে পাই তৃতীয় প্যারাগ্রাফে যামিনী রায়ের বিশেষত্বের বেশ সহজ ব্যাখ্যা। চতুর্থ প্যারায় অশোকবাবু বলেন, এই সব কটি বিশেষত্বই বাঙালী ঐতিহ্য, আবার এ সব কটিই ভারতীয় ঐতিহ্য, আবার এ সব কটিই বর্তমান পৃথিবীর, বিশেষ করে পশ্চিমের অন্বিষ্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তার ফলে অত্যন্ত আধুনিক। ব্যাপারটা কঠিন, তবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছু একটা বোঝা যায়।

কিন্তু তারপরে মাঝে মাঝে এমন সব উক্তি আসে যাতে যামিনী রায়ের চিত্রকলার স্বরূপ বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। ছাত্র যামিনী

রায় বোর্ডকাটা ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে ছবির পরিধি বা সংস্থান দেখে ছবির দৃশ্য বিষয় নির্দিষ্ট করছিলেন। এবং মাস্টার ব্রাউন সাহেব তাঁকে তারিফ করলেন—এর মধ্যে যে একটা বড়ো সত্য লুকিয়ে আছে, এর কাহিনীটি লিখতে ভুল করলেও সেটা অশোকবাবু ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সেটি শিল্পদৃষ্টির বড়ো সত্য। অশোকবাবু যে বলেছেন এর ফলে "যামিনী রায় কলকাত্তাই হবার লোভে সেই যে বাগবাজারের গলির বাড়ীতে ঢুকলেন"—এ কথায় সে সত্যটি নেই। কারণ ছবি মাত্রেই দৃশ্য বস্তুর পুনর্নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃসংগঠন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ দৃষ্টির নির্দেশে, দৃশ্যবস্তুর সীমায়নে, পরিধিকে ফ্রেমে ফেলায়, বাছাই করায়। "কলকাত্তাই" হবার সঙ্গে এর সত্যতার সম্বন্ধ নেই, যদিও মানতে হবে ছাত্র যামিনী রায় সেই সেকালেই শিল্পের এই সত্য বুঝেছিলেন নিজেরই শিল্প-জিজ্ঞাসায়। এবং মানতে হবে যে যামিনী রায়ের কলকাতায় আসা আর নানারকম কাজ করে কষ্টে ছাত্রজীবনযাত্রার মধ্যে দৈনিক বীরত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

এই হালকা অত্যুক্তির ঝোঁকে বা পরিহাসপ্রবণতাতেই বোধ হয় লেখকের ভুল হয়ে গেছে যামিনী রায়ের ল্যাণ্ডস্কেপের হিসাবনিকাশে, তিনি লিখেছেন: "তাই তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপে ঝড়জল নেই, নেই অগ্নিদগ্ধ দিন, এমনকি দিগন্তবিস্তৃত মাঠও নেই।" একথা সত্য যে যামিনী রায় নিজে তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলির সমধিক চিত্রমূল্য দেন না, কিন্তু সেখানেও তাঁর চোখের দেখা-চেনা, স্মৃতিজাত, কাল্পনিক বা বিদেশী কাজের পরীক্ষা-মূলক নানান্ ল্যাণ্ডস্কেপের বৈচিত্র্যে ও অসামান্য দক্ষতায় অবাক হতে হয়। আমি অন্তত কিছুতেই ভুলতে পারি না সংখ্যায় শতাধিক সেই সব বহির্দৃশ্যচিত্র—বাঁকুড়ার দিগন্তবিস্তৃত ঊষর মাঠ, সাঁওতাল দেশের পাথর মাটির ঢেউ, ধানখেতে লাঙলচাষী, থৈথৈ বাদল জলে মেয়েদের বীজরোপণ, রৌদ্রে ঝকঝকে বৃক্ষছায়াঘন মাঠপথবাড়ি, আলোছায়ায় প্রতীক্ষারত বস্তির ছবি, একাধিক অসুস্থ কলকাতার বিষণ্ণ বাড়িতে বাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি গলি; বাগবাজারের গঙ্গায় বোঝাই নৌকা, টিনের

শেড আর মেঘবিদ্যুতের ঘনঘটা বা আলোর দীপ্তি, টলোমলো জলধারা, নৌকায় পার্থিব কিন্তু অসীমে উধাও রহস্যময় জলরাশি, কাশিপুরের দোতলা বাড়ি, বেলেতোড়ের বা যে কোনো মফস্বলের বাংলো বা কুঠি, পাহাড় রেললাইনে স্টেশনের দুরন্ত বাঁক, দক্ষিণেশ্বরের বটগাছ, সুস্থ শহরের আদর্শ বীথি ও বাগানবাড়ী—কত বলা যায়। ছবিমাত্রেই তো একটুকরা রঙীন কাপড়, বা কাঠ বা বোর্ড, এবং যামিনী রায়ের ছবিও অবশ্য তাই। কিন্তু যামিনী রায়ের বহুবিচিত্র এই ছবিগুলি অশোকবাবু যথোচিত মনোযোগ দিয়ে দেখেন নি বলে তাঁর জন্য আমি দুঃখিত। নাহলে ঐ রঙীন কাপড়ের টুকরোর কথা বলে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন না।

তিনি বোধহয় যামিনী রায়ের প্রথাসিদ্ধ তৈলরীতির পোর্ট্রেটগুলির কিছুও মন দিয়ে দেখেন নি, তাহলে তিনি অবনীন্দ্রনাথের জলরঙীন প্রতিভার আলোআঁধারি লীলার সঙ্গে সেগুলিকে ফেলতেন না। বাস্তবিক পক্ষে, এই তৈলাঙ্কিত পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে অনেক ছবিই আছে, যার নৈপুণ্য ভারতে তুলনাহীন এবং যামিনী রায় নিজে সেগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ বললেও অন্যের মুখে সে কথার পুনরুক্তি ভ্রান্তিকর। তারপরে তিনি অবশ্য আবার চমৎকার শ্রদ্ধার সঙ্গেই লিখেছেন যামিনী রায়ের পরিণত যৌবনের শিল্পসমস্যার ও সমাধানের অনেক কথা।

কিন্তু এগারো প্যারাগ্রাফে অশোকবাবু আবার বিমূঢ় করে দেন ইওরোপীয় চিত্রের সংজ্ঞানির্দেশে ভিনিসীয় শিল্পী, এল্‌গ্রেকো, রেমব্রাণ্ট, কুর্বে ও দেলাক্রোয়ার নাম একনিশ্বাসে গেঁথে। ভিনিসীয় শিল্পীরা কি সব এক? এঁরা কি হিসাবে সবাই এক ধরনের শিল্পী, এক শিল্প-সমস্যায় ভাবিত এবং জিজ্ঞাসায় পরীক্ষারত? সে কি লেখক যাকে বলেছেন প্ল্যাস্টিক প্রতিমা, তারই পরীক্ষা? তাহলে ঐ কটি বিশেষ নামের পরম্পরার তাৎপর্য কি? আর ঐ প্ল্যাস্টিক প্রতিমা জিনিসটি ঠিক কি? সে কি, লেখকেরই ভাষায়, রঙের সবকিছু গুণ নিংড়ে বার করা, যার চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে প্রাচ্য অলঙ্কারাত্মক ডেকরেটিভ্‌

চিত্রে ? অলঙ্কারাত্মক ডেকরেটিভ চিত্রের ঝোঁক কি করে প্লাস্টিক বা স্পৃশ্যপেশলতাময় প্রতিমার ঝোঁক হবে ? এইটেই কি আমরা পাই বারো প্যারার সেজানের সাধনায়, এক নতুন শিল্পরীতিতে যিনি প্রথম প্রিমিটিভ ? কিন্তু তাহলে এই রং নিংড়ে প্রতিমারূপায়নের সাধনাকে আবার দুধারায় লেখক ভাগ করেন কেন ? পিকাসো বা ব্রাক্ এবং তারই সঙ্গে দেরাঁর চিত্র-কে কোনোমতেই কি বর্ণগৌণ বা বিবর্ণরূপ-প্রধান বলা যায় ? তেমনি মাতিস্ বা দুফি-কে সেজানের ধারার বর্ণসঙ্কর সন্তান না বলে বরং সেজান্-পূর্ব ইম্প্রেশনিস্টদের এবং প্রাচীন ও আদিম মানুষের এবং এশিয়া আফ্রিকার বর্ণরেখারূপের শিল্পরীতির সার্থক উত্তরাধিকারী বললে আরো সঙ্গত হত না ? অশোকবাবু নিজেই প্রায় তা বলেছেন, কিন্তু সেটা ১৫ প্যারাগ্রাফে।

অশোকবাবু যদি এক সেজান বিষয়েই আরো ধৈর্য ধরে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে আরো বেশী সময় ধ্যানধারণায় ব্যয় করতেন, তাহলে তিনি শিল্পের প্রেরণা কি জাতের হয়, আধুনিক শিল্পীর কি সাধ ও সাধ্য, কি তার গৌরব ও তার প্রায় অসম্ভবের অন্বিষ্ট কি, সে বিষয়ে আমাদেরও আরো স্বচ্ছ কিন্তু দায়িত্বসম্পন্নভাবে বোঝাতে পারতেন। তাহলে তাঁর মনে থাকত যে যামিনী রায় বা যে কোনো সৎশিল্পী তাঁর নিজের মানসের তাগিদে, স্বভাবের অখণ্ড প্রেরণাতেই কাজ করেন, কিছু ছাড়েন, কিছু গ্রহণ করেন—পরীক্ষা করে চলেন। তাইতো সৎশিল্পী লঘু মুহূর্তে খেলায় বা বিনোদনেও যা করেন তা একটা বৃহত্তর ঐক্যের প্রবাহে নিজের স্থান করে নেয়। এ মন তথাকথিত রম্যরচনার বিচ্ছিন্ন মন নয়, এবং এতে শিল্পীকে জনসাধারণ বা বালক বা কিশোর ইত্যাদি মনগড়া পাঠকশ্রেণী বা দর্শকশ্রেণী খাড়া করে নিজেকে এবং দর্শককে বিড়ম্বিত করতেও হয় না। শিল্পীর যন্ত্রণাময় আকুতি এবং কৃচ্ছ্রসাধনের এই বড়ো সত্যটা মনে রাখলে শিল্পকর্ম গ্রহণ করা সহজ হয়, তাহলে আর লেখক ১৬ প্যারায় যামিনী রায়কে "স্বদেশের দরজায় ধরনা দিয়ে" বসাতেন না। বস্তুত কোনো শিল্পী কারো দরজাতেই ধরনা দেন না, নিজের চোখ-মাথা

হাত ছাড়া। যামিনী রায়ের বিষয়ে ভাবতে গেলে ভ্যান্‌গগের কথাটা তাই স্মরণীয়ঃ আমাদের জীবন যাত্রা প্রায় মঠের ব্রহ্মচারী বা গুহাবাসী তপস্বীর মতো, আমাদের যন্ত্র শুধু কাজ, সব সুখ আরাম ত্যাগ করে। এরকম শিল্পীকে কখনো কখনো পরিব্রজ্যব্রতও নিতে হয় নিজের শিল্প-প্রেরণারই তাগিদে, নিজের সাধনার ও সিদ্ধির অসম্পূর্ণতার ও অতৃপ্তি-করতার ক্রমিক উত্তরণের বোধ থেকেই। কাজেই ইওরোপের খবর যামিনী রায়ের কাছে কবে এল বা এল কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। যে কোনো শিল্পীর বিচারে বাইরের লোককে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়, পাছে অবান্তর অবজ্ঞার লেশমাত্র এসে পৃষ্ঠপোষণের আভাসে বিচার-টাকে গৌণ করে দেয়।

আসলে বোধ হয় অশোকবাবু একটা বিশেষ ইওরোপকে মান স্থির করেই এই বিভ্রমের পাকে থেকে থেকে পা দিয়ে ফেলেন। কারণ ইওরোপ মূলে আমাদের তুল্যমাত্র, সমান নয়। তাছাড়া ইওরোপ বলতে শুধু কয়েকশো বছরের পোশাকী পশ্চিম ইওরোপ ভাবাও মূলের সন্ধানে ভ্রান্তিকর। অথচ গির্জা ও দরবারের বাইরেও শিল্পের উৎস খুঁজে যেতে হবে এবং দ্বিতীয় বা পূর্ণ রেনেসান্সের আগে অর্থাৎ বুর্জোয়া বিকাশের আগে আর আবার তার পরে; নাহলে ইওরোপের সস্তা টুরিষ্টের ইওরোপেই নিঃশেষ, নাহলে আধুনিক শিল্পের শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও, বোঝা যাবে না সেজানের মতো শিল্পীর কি অন্বিষ্ট, কি তাঁর সাধ্যের সীমা, সাধনার স্বরূপ ও তাঁর সিদ্ধি।

প্রকৃতির বিশেষ বস্তুরূপ ও শিল্পীর বিশেষ মানসের ছাপে মৌল-রূপের যে পুনঃসৃষ্টি আকারে ও বর্ণের শুদ্ধ একাগ্রতায়, তার ইতিহাস বুঝতে গেলে যেতে হয় ইতিহাসের প্রাচীন কাল অবধি, হাতে নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা। সেজানের মেজাজ বরং একদিক থেকে বলা যায় দ্বিতীয় রেনেসান্সের আগের মেজাজে দোসর খোঁজে, যে মেজাজে ত্রুবাদুর কাব্য, ডান্স স্কোটস ও রজর বেকনের জিজ্ঞাসা, বাইজান্টীয় ও সর্ব ইওরোপীয় আলোকময় শিল্প, শুদ্ধ মোডের সঙ্গীত।

যে মেজাজে অ্যাকোআইনাস চেয়েছিলেন রঙের স্পষ্ট সাকার ঔজ্জ্বল্য, যে মেজাজে বুর্জোয়াদুস্থ সেজানের মনে হয়েছিল যে তাঁর কাজ প্রকৃতিকে পুনর্জাত করা নয়, প্রকৃতিকে পুনঃপ্রতিভাত করা, এবং তা রূপসত্তায় এতই ভালোভাবে করা, যে সেজানের সংহতরূপ আপেল আর খাদ্যই থাকে না। তিনি বস্তুর সন্নিহিত রূপ চান, যে রূপ শিল্পীর মানসের চাপে যেন হাতের আঘাতে আঘাতে বেরিয়ে আসে, যা তৈরী করা নয়, জোড়া নয়। অবশ্যই তিনি চিত্রশিল্পী, তিনি তা করেছেন চিত্রের মাধ্যমে, আকার ও বর্ণের অখণ্ড ভাস্বরতায় ঘনতার সম্বন্ধপাতে। নিছক প্লাস্টিক বা সংযোজক গঠনের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, তাই তো আলোক বিকীরণে মানুষ বা আপেল, জলাধার বা পাহাড় বা গাছের সব কিছুর স্বকীয় দেহবিচ্ছুরিত ভাস্বরতার ও স্পষ্টতার মধ্যে তাঁর আকার ও রং হয় বস্তুর সব মৌলরূপে, প্রায় জ্যামিতিক রূপে ধৃত। সেজান প্রকৃতির বস্তুরূপে একটা অতিস্পষ্টতা আরোপিত করেন বস্তুর সমতলগুলিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে। তিনি অবশ্য ধ্রুপদী কনটুর বা দেহরেখাকে প্রাধান্য দিলেও তাঁর কালধর্মের প্রয়োজন অনুসারেই ঠুম্‌রির স্থানীয় রং একেবারে ছাড়তে চাননি, যা ছাড়লেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা। ওই একই কারণে সেজান টোনের ক্রমিকতাও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। কারণ তাঁর কালে, তাঁর সমাজে অগ্রগণ্য শিল্পচিন্তাতেও সেটা স্বাভাবিক ছিল, তখনও তাঁকে ভাবতে হয়নি বহিঃপ্রকৃতির রূপে দ্রষ্টা মানুষের কর্তৃত্ব কতখানি। প্রকৃতির সামনে সেজানের মনে স্বচ্ছতা আসত, কিন্তু প্রকৃতি তখনও, ওঅর্ড্‌স-ওঅর্থের ইঙ্গিত সত্ত্বেও, উনিশ শতকের বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক প্রকৃতি। অথচ সেজান্‌ বুঝেছিলেন এই প্রকৃতির অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা। তাই তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতিতে স্থায়িত্বের রোমাঞ্চ দিতে, কিন্তু তার চঞ্চল মায়াও তিনি একেবারে ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন নি। পরের শিল্পীদের, পিকাসোদের পক্ষেই সম্ভব হল, প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা প্রতিকৃতি আঁকা নয়, প্রকৃতিকে বদলে দেওয়া। কিন্তু সেজান বস্তুরূপগুলির প্রান্তসীমায়

সবল গণ্ডিরেখা বা পরিণাহ এনে তাঁর বর্ণসম্বন্ধের ঘরে ঐশ্বর্য আনলেন কারণ রঙীন রূপে গাঢ়তর রেখার বা পাড়ের বাঁধনে রং আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, রূপ আরো স্পষ্ট।

অবশ্য নিছক রঙের রূপের এই অর্ধনারীশ্বর শিল্পের অধরা আততি কিছুতেই শেষ হয় না, সং নিরাসক্ত শিল্পীর যন্ত্রণাও তাই অশেষ। এর ফলে সমান কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাগগুলিকে ঘনতায় নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, যেন প্রায় মোজেইক কাজের মতো। আগে বারোক্ চিত্রকলাতেও এরকম সমস্যা দেখা গেছে। সেখানে কিন্তু কোণাকুণি টানে এর সমাধান চেষ্টা। এর আরেক সমাধান দেখি পিকাসোর মতো আধুনিক শিল্পীর ছবিতে, যেখানে সব কটি চড়া রং সমান ও এক সময়ে গেয়ে ওঠে, কেউ ভিন্ন বা কেউ আগে পরে নয়। যামিনী রায়ের স্বকীয় রীতিবিন্যস্ত ছবিতেও দেখি এই বর্ণপরম্পারার সমতলিক ঐক্য। এই যে সাকার রঙের পারস্পরিক যোগবিয়োগের ঐক্য, এ অতি প্রাচীন শিল্পরীতিতেও পাওয়া যায় এমন কি আদিম গুহাচিত্রেও। আবার পাওয়া যায় সমস্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাসে সজ্ঞান আধুনিক শিল্পীর আতত কাজে এবং এই সব চিত্ররচনায় সংহতির উৎস সা-তেও নয় রে-তেও নয়, সমগ্র সুরলহরীতে অর্থাৎ সমগ্র চিত্রায়ণেই, রেখা ও রঙের অখণ্ডতায়। এই সমগ্রতাকে উপযুক্ত কথার অভাবে আমরা কখনও বলি কম্পোজিশন কখনও বা ডিজাইন বা প্যাটার্ণ। চোখ কিন্তু ভাষার চেয়েও ক্ষিপ্র এবং নিমেষে ধরতে পারে। আমাদের অনেকের আজ এই সংহতিতে এই শুদ্ধ সমগ্রতাতেই আনন্দ, তাই আধুনিক চিত্রকলা আমাদের বিচলিত করে সাক্ষাৎ আবেদনে, তাই তো দ্বিতীয় রেনেসান্সের চেয়ে প্রথম রেনেসান্সের অখ্যাত শিল্পীর কাজ বেশি মর্মে লাগে, তাইতো আধুনিক শিল্পের অন্বেষায় অজন্তার কৃতিত্ব গৌণ মনে হয়, পারসীক রাজপুত মুঘল দরবারীর চেয়ে বাংলা ওড়িয়া গুজরাটী পটপাটার ছবি বেশি তৃপ্তি দেয়।

অশোকবাবু চিত্রকলার মান নিয়েছেন ১৬ থেকে ১৯ শতকের ইওরোপের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপ্রধান যথাযথবাদী পোশাকী শিল্পরীতির চলতি

ধারণা থেকে। তাতে স্থানকালপাত্র বিবেচনা গৌণ হয়ে পড়ে এবং এই তুলনার প্রচ্ছন্ন অভ্যাস আমাদের মতো সাধারণ চিত্রোৎসাহী মানুষকে বিপথে ঘোরায়। তাই তো অশোকবাবুও যামিনী রায়ের ছবিতে কাংড়ার মেজাজ খুঁজে পেয়ে হয়রান হন। আবার তিনি ভিনিসীয়দের স্বরগ্রামযুক্ত বর্ণাঢ্যতা না পেয়ে যামিনী রায়ের এক যুগের ছবিতে রঙের ডিসোনান্স বা বিরোধ খোঁজেন, অথচ ছবিতে রঙের পিগমেণ্টের বর্ণাভাসে কমপ্লিমেণ্টরির চড়া বিবাদী সঙ্গতি বা প্রায়-কমপ্লিমেণ্টরির বিস্মিতসুষমাই শিল্পীর সন্ধান। কারণ আধুনিক শিল্পী লোকল বা স্থানীয় রং-মাহাত্ম্য মানতেই পারেন না, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ণরেখায় বস্তুর অখণ্ডতার রূপ দেওয়া তাঁর ছবিতে। তা ছাড়া সত্যই তো প্রকৃতিতে স্বয়ং স্বাধীন স্থানিক রং বলে কিছু নেই, ওটা ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যনির্মাতা ইওরোপের ভেদবুদ্ধিগত দেখার একটা মালিকানা অভ্যাস মাত্র। প্রকৃতির সংজ্ঞা আজ ঊনিশ শতকের আধিদৈবিক বা অমানুষিক দর্শনের তত্ত্ব নয়, আজ দ্রষ্টা ও দৃশ্য আপন নির্দিষ্ট সীমায় আরও সজীব ও কর্মিষ্ঠ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ। তাইতো পিকাসো বলতে পারেন : "আবস্ট্রাক্ট আর্ট বলে কিছু নেই। বস্তু থেকেই সব আরম্ভ।" বা বলেন : "আমি যা দেখি তাই আঁকি।"

বস্তুর গাত্র বা স্থানীয় বর্ণ বস্তুতে আলোকসম্পাতেরই স্থানবিশিষ্ট প্রকাশ, যা দেখা যায় শুধু কাছের খণ্ডিত দৃষ্টিতে। তাই মাতিস বলেন : আমার কাছে শিল্পরূপ একটি মুখের বিচ্ছুরিত বা একটি প্রবল ভঙ্গিতে প্রকাশিত ভাবাবেগে নেই, আমার শিল্পাবেগ আসে আমার ছবিটির সমগ্র বিন্যাসে—এতে মূর্তিগুলির সংস্থান, তাদের আশেপাশের খালি স্থান, পরস্পরের সামঞ্জস্য—সব কিছুই যে-যার কাজ করে যায়। আধুনিক শিল্পী তাই এই স্থানীয় রঙের জের বাদ দেন বা রূপান্তরিত করে দেন পরিপূরক বা প্রায়পরিপূরক বর্ণমালার সমগ্রতায়। আবহবর্ণের ব্যবহারেও তাই হয়, যে বর্ণাভাসে দূরের পাহাড় আকাশের রঙে বাঁধা পড়ে হয়ে ওঠে ঘননীল বা লঘুনীল বা সবুজনীল। আলোকদ্যুতি বা

প্রতিফলিত বর্ণ, যার আভাসে সান্ধ্যআলোয় শুভ্রশৃঙ্গ হয়ে যায় কষিত-লাল, সেও তাই আধুনিক চিত্রকরের বর্ণপ্রয়োগে সমগ্রতার প্রতিক্রিয়ায় নতুন বৈশিষ্ট্য পায়। গোগ্যাঁর কথা মনে পড়েঃ সর্বদা স্মৃতি থেকে এঁকো। রঙের প্রতিসাম্য নয়, সমস্বর খুঁজো। শুধু বিশ্রামের রূপ আঁকবে। সর্বদা গণ্ডিরেখা দেবে। খণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ অংশ নিয়ে ভাবিত হোয়ো না। কখনও বিচ্ছিন্ন রং ব্যবহার কোরো না।

প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভালো যে তত্ত্বের বর্ণ এবং শিল্পীর ব্যবহার্য দ্রব্যবর্ণ সর্বদা সমমূল্য নয়। সিঞাকের কথা ভাবুনঃ লাল ও সবুজে হলদে হয়, কিন্তু ছবির আকাশে যদি লাল ও সবুজ বিন্দু সমষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে ফলে দাঁড়ায় একটা বর্ণহীন ক্লৈব্য। কারণ হলদে ব্যবহার্য রং হিসাবে শুদ্ধ বা প্রাথমিক, যদিও আলোকের দিক থেকে মিশ্র, অর্থাৎ ছবিতে সাক্ষাৎ হলদে প্রলেপেই আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা সম্ভব। তাছাড়া, শিল্পীর বর্ণবস্তুর কোনো স্বকীয় সার্থকতা বা দ্রব্যগুণ নেই, তার প্রাণ আসে শুধু সম্বন্ধপাতে, অন্য রঙের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বাদ-প্রতিবাদে এবং সবটার আর প্রত্যেকের প্রভা নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক আলোকস্পন্দনের স্বরগ্রামের উপরে। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল যে নীলের বিবাদী কম্‌লা, হলদের বেগনি। আজকাল শিল্পীরা জানেন যে চোখের নেতিবাচক প্রতিচ্ছবির নিয়মানুসারে নীলের পরিপুরক হচ্ছে হলদে, বেগনির পালটা সবুজ, লালের সমুদ্রশ্যাম, কম্‌লার আকাশনীল বা ফিরোজা।

কিন্তু এই সব মুলবর্ণের নানান্ আভাস, এক হলদেই কত রকম হয়, তাছাড়া এরঙে ওরঙে মেলে, শাদার প্রভাবও আশ্চর্য। শিল্পীরা জৌলষও পালটান, কখনও মেরে দেন বা কখনও চড়া করেন বা কখনও গণ্ডি-রেখা'র সাহায্যে রঙের পর্দা ওঠান বা নামান। যামিনী রায়ের হাতে তাঁর পরীক্ষা-যুগের সব ছবিতেই টোন বা বস্তুর আকাডেমিক প্রথার খণ্ড-বর্ণের রেশ গৌণ, কারণ ছবির ও তন্নিহিত বস্তুর বা বিষয়ের স্পষ্টতা ও সেই সঙ্গে বর্ণসমগ্রতাই তাঁর লক্ষ্য। অবাক হতে হয় তাঁর বৈচিত্র্যে,

একদিকে বর্ণসমগ্রতার বিন্যাসের অফুরন্ত নবনব উদ্ভাবন আর অন্য-দিকে চিত্রবস্তুর নিত্যনব ভিন্নভিন্ন রূপ বা থীম। তাইতো সেজান বলেছিলেন : যখন বর্ণিকাভঙ্গে বা রঙে আসে ঐশ্বর্য তখন রূপভেদে আসে সাকার পূর্ণতা।

এই বৈচিত্রের ইতিহাস বিষয়ে অশোকবাবু যথেষ্ট অবহিত নন, ফলে যামিনী রায়ের কাজের যে ইতিহাসটি তিনি দিয়েছেন তাতে শিল্পীর বিকাশের বা সন্ধানের তাৎপর্য ও পরম্পরাটি স্পষ্ট হয় নি। যামিনী রায়ের তৈলচিত্রপর্বটি তিনি প্রায় বাদই দিয়েছেন। পুরোপুরি প্রথা-সিদ্ধ তৈলপ্রতিকৃতি যামিনী রায় অনেক এঁকেছিলেন, তার বাস্তবতা ও নৈপুণ্য আজও ভারতে বিস্ময়ের বস্তু। এই প্রতিকৃতির অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল তাঁর কয়েকশত ফোটোগ্রাফিক চিত্রণে, নানা টাইপের মুখের জ্ঞান তাই তাঁর স্মৃতির মজ্জায় মজ্জায়। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রে সব অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে। জীবিকার জন্য গরানহাটার এনগ্রেভিংএ রং দেওয়া কাজ, লিথো-ছাপা, ব্লক প্রোসেস রঙের ছাপাখানার কাজ, ইহুদী ভদ্রলোকের কাজে পোস্টকার্ডে তিন আনায় শ হিসাবে রং দেওয়ার দু-বছর-ব্যাপী অভিজ্ঞতা—সবই তাঁর চোখের হাতের জ্ঞানে পরে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিশ বছর ধরে বাংলা থিএটারের অভিজ্ঞতাও তাঁকে দূর থেকে মানুষের চেহারার গোটা রূপ ধরতে সাহায্য করছে, এমন কি কাপড়ের দোকানের অভিজ্ঞতায় তিনি নিশ্চিন্ত হন ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন ও রঙের চাহিদার বিষয়ে।

তাই তাঁর প্রথম যুগের কাজ তাঁর পরের চিত্র-বিচারে নগণ্য নয়—তার নিজের উৎকর্ষ ছাড়াও। কিছু শরীরচিত্রও এই যুগে তিনি আঁকেন, ভাণ্ডারকর বা আবদুল আলির মতো দরদী শৌখীন ব্যক্তিদের জন্য। তারপর তিনি আঁকতে সুরু করেন তাঁর স্পষ্টতই পরীক্ষামূলক ছবি : সান্ধ্য আলোয় মৃতদেহ, তুলসীতলায় বাঙালী নারী, নমাজ-নিবিষ্ট পুরুষ, বংশীবাদক ইত্যাদি। এগুলিতে, যাকে অশোক মিত্র বলেছেন মডেলিং বা প্লাস্টিক গুণ তা বর্তমান এবং রঙের আমেজও এগুলিতে

বর্তমান, কারণ এতে রঙে টোন বা তানের বিলীয়মান রেশ আছে। তারপরে দেখি এই নিবাত নিষ্কম্প সান্ধ্য আলোর দ্বিধাহীন সুষমাই প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ রঙের টোন বা আমেজ গৌণ হয়ে যায়, রঙের বৃহত্তর রূপায়ণ আসে এক জাতের ছবিতে : সাঁওতাল মেয়ে চুল বাঁধছে বা চুলে ফুল সাজাচ্ছে বা নদীতে দাঁড়িয়ে জলে রেখে মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছে, মা ও ছেলে নত হয়ে প্রণাম করছে ইত্যাদি অনেক ছবি। এরই আরো শুদ্ধ বর্ণরূপায়ণ দেখি বিধবা কৃশ যার হাতে ছেলে কিম্বা বৃদ্ধ ষাঁড়,—এসব ছবিতে বর্ণবিলাস যাঁর স্বভাবে গভীর তিনি রূপের তপস্বী মৌলিকতা খুঁজেছেন। তারপরে রঙীন রেখার টানে রঙীন জমির সমলেপ ছবিগুলি। এই সব ছবিতে প্লাস্টিক বা গড়ে গড়ে-তোলা বর্ণযোজনার চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে সাকার রঙের সমতা এবং যেন খোদাই বা রূপনিষ্কাশিত মূর্তির বর্ণাভাস।

কিন্তু তবু রঙের ভাবাবেশ কেন যায় না? তোতাপুরীর নির্দেশে রামকৃষ্ণের সেই দেবীর সাকার ধ্যান বর্জন করার সঙ্গে তুলনীয়, সেজানের মতো, পিকাসোর মতো, যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের পূর্ণতার পথের এই প্রগতির যন্ত্রণা। যামিনী রায়ের একলব্য সাধনা তাঁকে নিয়ে গেল উপবাসীর তম্বু সৌন্দর্যে, সর্ববর্ণের সার নীলকণ্ঠ শুভ্রতার আভাস ও কৃষ্ণধূসরিমার বিন্যাসে, তিনি আঁকলেন রেখার বলিষ্ঠ রূপবর্ণে চোখের ভিতরের নীলধূসরের আর বাইরের আকাশের ধূসর নীলিমার শত বস্তুর প্রতিমা। কিন্তু শুদ্ধির এ তাপসী রূপ তাঁকে বাধল না, প্রশ্ন এল এই শুদ্ধি কি বর্ণকে উহ্য করার জন্যই? রঙের মর্ত্যসংসারেও কি শুদ্ধি থাকবে না? তাই তারপরে তাঁর ছবিতে ফেটে পড়ল মৌলিক বর্ণের প্রখরছটা।

আধুনিক কবিতায় যেমন, সঙ্গীতে যেমন, আধুনিক ছবিতেও শিল্পকর্মের সার্থকতা আবেশের রেশে নয়, গল্পের জেরে নয়; তার লক্ষ্য বস্তুর জড়িত গলাগলি রূপ নয়, স্পষ্টবর্ণায়নেই শিল্পবস্তুতে রূপের স্পষ্টতা। আধুনিক বর্ণব্যবহারে তাই প্রথাসিদ্ধ মেটের প্রাধান্য নেই;

স্থানীয় বা অঙ্গনিবদ্ধ বর্ণফলের মিশ্রণ। যামিনী রায়ের এই সব ছবির রঙের ব্যাখ্যায় রংগুলিকে ডিসোনাণ্ট বা বিবাদী বলায় কিছু বোঝা যায় না, কারণ এই সব ছবির স্পষ্ট রংপ্রয়োগের পারম্পরিক বিন্যাসের অখণ্ডতাতেই গোটা ছবির সম্পূর্ণ ছবিত্ব। কম্‌প্লিমেণ্টরি বা পরিপূরণা-পেক্ষী রঙের ব্যবহারেও তাই। এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে আপাতবিবাদী বা সম্বাদী বর্ণব্যবহারে চিত্রে আসে স্পষ্টরূপ বা স্বাধীন একটা রূপ যা দক্ষশিল্পীর হাতে পায় অনিবার্য একটা সামগ্রিক বর্ণসুষমা বা সঙ্গত রঙের আমেজ; সে আমেজ সারা ছবিটি জুড়ে, জীবন্ত মানুষের রূপের মতো বা বলব, ব্যক্তিত্বের মতো বিশেষ।

অবশ্যই এ আমেজ তথাকথিত রেনেসান্স থেকে গতশতকের প্রথা-সিদ্ধ ইওরোপীয় চিত্রে যে জড়িত টোনের বা স্বরভাঙা অনুবাদী মিশ্রণের লোভী আমেজ, তা নয়। তাইতো সেজানের আপেলে এতই বিশিষ্ট আপেলেরই প্রত্যক্ষ সত্তা, যে সে আপেলে আর লুব্ধ খাদ্যতা অবশিষ্ট নেই। একালের ধারণায় বস্তু বা ব্যক্তির সত্তা রং বা আলো বা খেয়ালের একতরফা আকস্মিকের উপরে নয়, নির্ভর করে সংহতির উপরে। একালের শিল্পী যেন প্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সেই পাখি, যে দেখত আর যার সঙ্গী খেত তার এই দেখনপাখির আনন্দই বেশি। ভাবা যায় আজ এমন দৃষ্টিও, যে দৃষ্টি ভালোও বাসে আবার দেখেও এবং যে দুয়ের বিরোধ সমন্বয় করে বস্তুকে বা অন্যকে সম্পূর্ণ সত্তার মর্যাদা দিয়েই, উভয়ত সচলস্বাধীন সম্বন্ধপাতের মধ্যে দিয়ে। একালের মানসে, এর সনদ মেলে মানবিক কারিটাসে প্রেমে, যেটা সোভিএৎ মানুষে ইতিমধ্যেই অনেকে লক্ষ্য করেছেন।

এ বিষয়ে অশোকবাবু নিশ্চিত না হওয়ায় এবং যামিনী রায়ের বিরাট চিত্ররাশির পরম্পরা বিষয়ে অন্যমনস্ক থাকায় তাঁর আলোচনাটি তাঁর চিন্তার গোলকধাঁধায় আমাদেরও ঘুরিয়েছে। শিল্পবিচারে বোধ হয় নিজের এবং নিজের কালের রুচির কি প্রয়োজন সে বিষয়ে মনস্থির করাটা তাই এ প্রাথমিক। তাইতো পিকাসো বলেছিলেন যে অতীত শিল্প বলে কিছু নেই, বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীত প্রাণ যায়।

এদিকে যামিনী রায়ের বৈষ্ণববিষয়াশ্রিত ছবি, রামায়ণের ছবির দুটি পালা, সঙ্গে সঙ্গে রেখাপ্রধান ছবির বিবর্তন চলল। তাঁর নিজের দেশী ঘরানায় বিদেশী পুরাণের রূপদানের সমস্যায় এল বাইবলবিষয়ক ছবি-গুলি, যেখানে পাপপুণ্যের লোকোত্তর বিশ্বাসের রূপ দিতে হবে ছবির চিরলোকায়ত মাধ্যমে, অতীন্দ্রিয় রূপকের ঘটনাকে রূপ দিতে হবে চাক্ষুষের গ্রাহ্যতায়। কিন্তু এ গম্ভীর স্নিগ্ধ ঘরোয়া কিন্তু অমর্ত্যের রূপায়নের সাফল্যেই তো শেষ নয়। যামিনী রায়ের শিল্পে যন্ত্রণা আসে থেকে থেকে, পিকাসোর মতো তাঁরও শিল্পজীবন ফাঁড়ায় ফাঁড়ায় অস্থির অশান্ত। তাই বিশ্রামহীন দৈনন্দিন শিল্পকর্মে রত এই শান্ত বাঙালী শিল্পীকে দেখি তাঁর হাতের রেখার কৃতিত্বে ক্লান্ত হয়ে রেখার টানের ছবিতে এবারে পাথুরে জমির শারীরিকতার সন্ধানে ব্যস্ত। ভুসোর শাদার বিন্যাসে জমি আঁকার কঠিন রহস্যের দ্রুত আকস্মিকতায় ফুটে ওঠে এই সব মৃত্তিকাধৃত স্থির কিন্তু প্রাণময় মূর্তিগুলি। বা ফুটে ওঠে অধরা আবেগের সৌন্দর্যে গেরিমাটির তীব্র জমি আঁকার বিন্যাসে একক বা বহু মানুষের রূপের শুদ্ধস্বর। এদিকে আবার নিছক আল্‌পনা-বিন্যাসে যামিনী রায় উত্তরোত্তর মন দেন, ফলে শুদ্ধ বা বিষয়ত্যাগী নক্সার ছবিতে আসে রহস্যময় গভীর রূপাভাস।

খবরের কাগজে, চটে, ছেঁড়া কাপড়ে ছবি তো আগেই হয়েছে। এবারে যামিনী রায় তালপাতা নারকেলপাতা হাতের কাছে পেয়ে একদিকে সরু ফালিতে আঁকেন অতি সূক্ষ্ম ছবি, আবার বিচ্ছিন্ন চাটাই জমিতে আঁকেন মোটাপোঁচের ছবি। এঁকে নিজেই বিস্মিত হয়ে যান এর সম্ভাবনায়। কেটেফেলা বোর্ডের টুকরোর বুনন জমিতে আঁকা শুরু হয়ে যায়, রং পড়ে মোটা ঔজ্জ্বল্যে কিন্তু এক স্নায়বিক শক্তির সংহতিতে।

অশোকবাবু লিখেছেন যামিনী রায়ের গত কয় বছরের ছবির ভাস্বরতার প্রসঙ্গে যে যামিনী রায় "অধুনা নানাদেশের চিত্রপদ্ধতি ঝালিয়ে" নিচ্ছেন। কথাটা সম্পূর্ণ নয় এবং অসম্পূর্ণ কথার অর্ধসত্যের বাঁকা আলোয় সত্যটুকুও বোঝা যায় না। অন্য দেশের বা অন্যের ছবির

বিষয়ে যামিনী রায় বরাবরই শ্রদ্ধাবান উৎসুক জিজ্ঞাসু। কিন্তু সে জিজ্ঞাসার ঘাট মেলে তাঁর নিজের কর্মধারা থেকে উত্থিত শ্রোতে। পুরানো ছবি সংস্কার করতে গিয়ে রঙের পোঁচ বা তেলের ছোঁয়াচ দিতে গিয়ে, বুনবছবি এঁকে, তাঁর রং ব্যবহার পেয়ে গেল নতুন দ্যোতনা, তাছাড়া রঙের প্রস্তুতি মিশ্রণ, আঠার তারতম্য এ সব তো আছেই। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল স্বভাবের গভীর তাগিদ—আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবন একটা সাম্প্রতিক ভারতীয় আত্মতৃপ্তিতে যতই মেটে ময়লা হয়ে যাচ্ছে রঙের ভাস্বরতার প্রতিবাদী প্রয়োজন স্নায়ুর গভীরে ততই কি তীব্র হয়ে ওঠে? যামিনী রায়ের কাজে দেখা যায় শিল্পীর নিজের সিদ্ধিকে বারংবার নবনবপর্যায়ে উত্তরণ; অথচ এসব অভিযানেই একটি যোদ্ধার শিল্প স্বভাবের ব্যাকুলতার শক্তি স্পষ্ট। তাইতো তাঁর রেখা আবার ভাঙল, এক দুর্মর স্নায়ুশক্তির টানে টানে রঙের আন্তর ভাস্বরতায়, যেখানে বস্তুরূপ যেন প্রাণ পায় রেখার গতিতে ততটা নয়, যতটা রূপের অন্তর্নিহিত বর্ণাভাসের দ্যুতিতে রেখার স্পন্দনে। এই থেকেই তিনি এলেন, সাহেবীভাষায়, মোজেইকের খচিত ভাস্বরতার এক ফ্যুগাল বিস্তারে, যাতে লোকসঙ্গীত কাউণ্টরপএণ্ট্ থেকে সোনাটা সিম্ফনির সমস্যা নতুন হয়ে আসে গ্রোস্ফ্যুগে, বা বুঝি বার্টকের কোয়ার্টেটে।

আমার মনে আছে ঠিক সেই সময়ে যামিনী রায়ের কাছে এল বাইজাণ্টীয় মোজেইকের বই, এবং তাঁর কি তৃপ্তি এই সমর্থন দেখে। তাঁর জীবনে এরকম ব্যাপার বার বার ঘটেছে। আজ মনে হচ্ছে সেই সে যুগের সান্ধ্য আলোর ভাস্বর সুষমার সন্ধান আজ যেন বৃত্ত পূর্ণ করে আসছে সব কটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিমিতি ও প্রাচুর্যের মধ্যে রূপের বলিষ্ঠ রেখার আলোকময় স্পন্দনে। এতে মিশরী চিত্র থেকে বাইজাণ্টীয়, দুচ্চ্যো, সিমোনে মার্তিনি, জ্যোত্তোর অগ্রজ মোজেইক-শিল্পী যিনি স্থাপত্য থেকে ছবিকে মুক্তি দিলেন সেই কাভালিনির গির্জার রঙিন কাচচিত্র, রুশ আইকনচিত্র সবাই উদাহরণ জুগিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে। অবাক লাগে ভাবতে এই বিচিত্র সম্পূর্ণতা, এর পরে

বিকাশের কি স্তর দেখতে পাব কি জানি, এবার কি শিল্পী জীবনের কুরূপকে দেবেন শিল্পের কুরূপবিজয়ী আরেক রূপ?

যামিনী রায়ের শিল্পপ্রেরণার বিষয়ে একটা দোমনা বা লঘুভাবের জন্যই লেখকের মনে হয়েছে, "তাঁর থীমের বৈচিত্র্য খুব কম।" না হলে চোখ মেলে এবং ধৈর্যসহকারে কিছুকাল ধরে যামিনী রায়ের কয়েক হাজার ছবি ও কয়েক হাজার ড্রয়িং—চল্লিশ বছর, প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যেপে প্রতিদিনের কাজ দেখলে কেউ একথা বলতে পারতেন না, এমন কি নিছক বিষয়থীমের দিক থেকেও না। বস্তুত, এক পাবলো পিকাসো ছাড়া থীমের এত বৈচিত্র্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোনো শিল্পীর কাজে নেই।

অবশ্য অশোকবাবুও প্রায় সেই কথা বলেছেন দু লাইন পরে ছত্রিশ প্যারাগ্রাফে—"এই বিরাট শিল্পীর সারাজীবনের কাজ এত বিচিত্র যে......" আশা করি যামিনী রায়ের বৈষ্ণব মনোভাব ও বীজমন্ত্র বিষয়ে পঁয়ত্রিশ প্যারাগ্রাফের মজা করে বলা কথাটা এই উক্তিতে শাক্ত বা নাস্তিক হাওয়ায় উড়ে গেছে। আসলে তিনি যামিনী রায়ের ছবিকে শুধু অবজেক্টের প্যাটার্ন বা ডিজাইন ভেবে মুশকিলে পড়েছেন। অবশ্যই যামিনী রায়ের ছবিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনা মূল লক্ষ্য, অনেক প্রাচীন চিত্রকলা বহুদেশের লোকশিল্প ও অনেক আধুনিক চিত্রশিল্পীর কাজের মতোই। কিন্তু এ ডিজাইন মাতিসের মতো যামিনী রায়ের ছবিতেও চিত্রগত পরিকল্পনা, চিত্রগত বিন্যাস, দেয়ালে সাজিয়ে আনন্দ দেবার জন্য। যার ফলে এই ডিজাইনের মাছিমারা সংক্ষিপ্তসার শাড়িতে বা পুতুলে, ধাতুর থালা বা ট্রেতে নকল অত বেমানান লাগে। সেইজন্যই তো যামিনী রায় যখন মাটির জালা বা থালা বা বাটিতে নিজেই ডিজাইন আঁকেন, তখন তার প্রকৃতি পাত্রটির প্রকৃতির মতোই করেন, ছবির ডিজাইনে নয়। তাই এই ডিজাইন উল্লেখ করে অশ্রদ্ধার রহস্যচ্ছলে বৈষ্ণব বীজমন্ত্র ছড়িয়ে যামিনী রায়ের কোনো কোনো ছবির একাধিক সংস্করণ ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অর্থহীন। তাঁর একজাতের অনেক ছবিতে

পরিকল্পনা বা আলেখ্যবিন্যাস বহু সাধনায় অর্জিত সরলতা ও নিশ্চয়তা পায় এবং তখন সেই ছবি একাধিক ব্যক্তির ভালো লাগলে একই ছবির লিপি একাধিক ব্যক্তির আয়ত্তে তিনি এনে দেন, দামী সংস্করণের প্রায় সমান দামে—এই তো হত সোজা ব্যাখ্যা।

একটি বেগনি-নীল ঘোমটা-পরা গোরোচনা মেয়ের মুখ দেখে ভ্‌সেভেলড পুদভকিন যখন তন্ময়, তখন ভয়ঙ্কর ইভানের, মায়াকফস্কির অভিনেতা চেরকাসভ্‌ সেই ছবিটির জন্যই সরবে কাতর; প্রবল রুশ ইংরেজি সংলাপের মধ্যে তাঁকে বহু ছবি দেখানো হল কিন্তু অভিনেতা ডেপুটির মন আর ভরল না; বিরাট মানুষটি স্পষ্টই ছোটো হয়ে যেতে লাগলেন, এমন কি তাঁর মাথা মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল; এদিকে পুডভকিন তখন আনন্দে বিহ্বল : বাঙালী বধূটি মস্কোতে যাবে, তিনিই কি ওটি প্রথমে নাছেন নি? শেষটায় ঐ ছবিরই আরেক অনুলিপি চেরকাসভ-কে শান্ত করল, উল্লসিত নাট্যশিল্পী চৌকি ছেড়ে উঠে লম্বা অতিকায় হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ স্বাভাবিক বড়ো হয়ে উঠল : ঐ ছবি লেনিনগ্রাদেও যাবে, রাশিয়ার ঐ দুই মহানগরী, প্রায় রাজধানী, দুই বোন যেন; একটি যাবে দিরেকতরের সঙ্গে, আরেকটি আকতরের সঙ্গে।

দ্বিতীয়ত, যামিনী রায় তাঁর সুলভ্য বা দুর্লভ সব ছবিই সাধারণ মানুষকে নন্দিত করতে হাতে দিতে চান; জীবিকার প্রথা মতো বাধ্য হয়ে তাঁকে একটা দাম নিতে হয়, যার জন্য তাঁর অস্বস্তিবোধ সবাই লক্ষ্য করেছেন। যত বেশি মানুষ ঘরে ছবি রাখবে, ততই জীবন ও শিল্পে রুচিবিস্তার ও আনন্দের প্রসার। তাই তো পিকাসো বলেছিলেন যে তাঁর ইচ্ছা হয় অনেক শস্তার এন্‌গ্রেভিং করে অনেক কাপি করে তাঁর ছবি জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দিতে।

• কিন্তু যামিনী রায়ের বিরাট চিত্রসম্ভারের মধ্যে টাইপমুখের প্রাচুর্য অশোকবাবু কেন দেখতে পাননি জানি না, বিশেষ করে তাঁর মতো সতর্ক-মন্য সমালোচক যিনি যামিনী রায়ের কয়েক হাজার বিশিষ্ট ছবির মধ্যে

একটি পসারিনী (?) এবং একটি ছোটো নাচের ছবিও উল্লেখ করতে ভোলেন না! একালের পোর্ট্রেটের বিষয়েও তাঁর কথা মানা শক্ত। গান্ধীজীর পাঁচ-ছয়টি পোর্ট্রেটে, রবীন্দ্রনাথের চার-পাঁচটিতে এবং সুধীন্দ্রবাবুর পোর্ট্রেটে যামিনী রায় বিষয়ব্যক্তির একটি চারিত্র্য খুবই স্পষ্ট ধরেছেন, অবশ্যই শিল্পীর দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে।

আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে অশোকবাবুর শেষ উক্তিতে : ভারত অশান্তি চায়, কাজেই যামিনীবাবুর শিল্পরচনা ভারত বা তাঁর স্বদেশ গ্রহণ করবে না, কারণ তাঁর ছবি শান্তির ছবি! শান্তির সাধনা তো মানুষ অশান্তির জন্যই করে; আর মানুষ শান্তি চায়, ভারতও চায়, বর্তমান পৃথিবীই চায়। দ্বিতীয়ত যামিনী রায়ের চিত্রাবলীতে রূপের সন্ধান জীবনের, আমাদের জীবনের প্রতিবাদ অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির জন্য, কুৎসিত অসম্পূর্ণ অসুস্থ অন্যায় থেকে ন্যায়সঙ্গত সম্পূর্ণ সুস্থ, সুন্দর জীবনের নির্মাণের প্রেরণায়। কোনো শিল্পীর প্রতিভার সীমা নিরূপণ প্রচেষ্টায় এরকম কথা চমকপ্রদ হলেও অসার।

মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ

* * * এই কথাকটি পিকাসোর বন্ধুত্ব-কে বহন ক'রে নিয়ে যাক। বহুকাল আগে আমি বলেছিলুম যে লোকে যেমন নির্ঝরের মুখে গিয়ে পৌঁছায় আমিও তেমনি কম্যুনিসমে এসেছিলুম এবং আমার সমগ্র কাজই আমায় এই গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

মস্কোতে সাধারণ লোকের জন্য এক পিকাসো প্রদর্শনী হচ্ছে আর তাতে কিছু সম্প্রতিকার কাজও থাকছে জেনে আমি আনন্দবোধ করছি। * * *

উপরের সামান্য কটি কথা পিকাসোর সংক্ষিপ্ত বাণীর আরম্ভ। মস্কোতে কিছুকাল আগে পিকাসোর ছবির প্রদর্শনী আনন্দের সংবাদই বটে। অবশ্য মস্কো লেনিনগ্রাদের মানুষের কাছে পিকাসোর কাজ নতুন নয়, সোভিএত দেশে পিকাসোর প্রথম দিকের কাজের নমুনা নগণ্য নয়, এবং বড়ো ছাপা ছবিও চিত্রানুরাগী ব্যক্তিরা পেতেন সহজে। সেই কবে ১৯২২ সালে মায়াকফস্কি এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ব'লে পিকাসোকে অর্ঘ্যদান করেছিলেন। তবু এ কথা মানতে হবে যে সোভিএত দেশে যে বিরাট সামাজিক রূপান্তর, যে বৈপ্লবিক নির্মাণ তিনচার দশক ধ'রে চলেছিল, তার আশু প্রেরণার চাপে, সাক্ষাৎ ফলাফলের প্রাথমিক উৎসাহে শিল্পের অনেক মৌলিক চিন্তা সংখ্যা-গরিষ্ঠ চিন্তাজগতে গৌণ হ'য়ে পড়েছিল। ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম সাহসিকতম সমাজপরীক্ষার দেশে শিল্পের পরীক্ষামূলক কাজ রুদ্ধ না হলেও কিছুটা অবহেলা পেয়েছিল, কিছুটা নিন্দাও। তা সত্ত্বেও সোভিএত দেশে প্রগতিশীল কবিরা, প্রগতিশীল শিল্পীরা তাঁদের কাজ ক'রে গেছেন, তর্কাতর্কির মধ্যেই কাজ করে গেছেন।

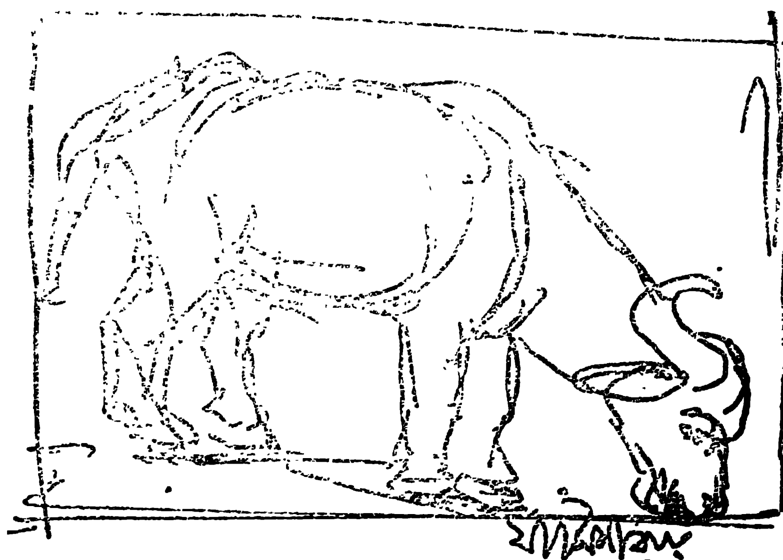
রুদিন, বাজারফ্, রাসকলনিকফ, কারামজফ্, লেভিনের দেশে আজও মানুষরা কথা বলতে ভালোবাসে, আরাম পায় তর্ক করতে,

বাকযুদ্ধ করতে। তার উপরে সাম্যবাদ আবার এই প্রবণতার পোষক বটে। কিন্তু এ কালের ইংলণ্ডের লোকেরা ভুল বুঝলেও আমরা কেন ভুল বুঝব? সেকালের ইংলণ্ডের মতো আজও আমাদের দেশে তো তর্কাতর্কি, হাতাহাতি, চুল ছেঁড়াছেঁড়ির পরেও দেখা যায়, বন্ধুরা গলাগলি করে, মেয়ে-পুরুষ সংসার করতে যায়। পাস্তেরনাককে তাই স্তালিন টেলিফোন করেন, কেন তিনি প্রাভদায় লেখেন না প্রশ্ন ক'রে।

অন্য দেশ হ'লে এই পরীক্ষামূলক শিল্পের প্রগতি চলতে গিয়ে সমাজবিচ্ছিন্ন কৌলিকমন্য হ'য়ে পড়ত এবং বিরোধীকে সমাজের হর্তাকর্তারা কোনদিনই মানতে পারত না। প্যারিসে কিছুকাল আগেও পিকাসোর প্রদর্শনীতে তাই পুলিশ ডেকে ছবি বাঁচাতে হয়, ইংলণ্ডে সর উইনস্টন চার্চিল বলেন যে পিকাসোর মতো শিল্পীর পশ্চাতে পদাঘাত করা উচিত। অবশ্যই পিকাসো জন বুল্-কে জবাব দেবার দরকার মনে করেন নি। কিন্তু মস্কো প্রসঙ্গে জঁা-পিএর সালতাঁ-কে তিনি বলেন: আমি খুব খুশি। জানোই তো, অনেক কিছুই বলা হয়েছিল, আমার আর আমার ছবির সম্বন্ধে। তাতে কষ্ট পেয়েছি। কষ্ট পেয়েছি বটে···প্রতিবাদ করি নি। এখন এই মস্কোর প্রদর্শনী খুব পরিতৃপ্তির ব্যাপার।

প্রত্যেক দেশেই বিশেষ ক'রে গত কয়েক শো বছর ধ'রে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকে; মোটাভাবে বলা যায় যে একটা ধারায় থাকে সহজগ্রাহ্য চালু রচনার আর সহজে গ্রহণের মন, আরেকটা ধারা হচ্ছে চৈতন্যের নতুন বিস্তারের ও শিল্পকলার নতুন বিন্যাসের প্রয়াস। খামকা সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যে তার ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ নেই। ব্যতিক্রম শুধু বোধ হয় এইটুকু যে অন্যদেশে কর্তাব্যক্তিরা থাকেন শিল্প সাহিত্যের বিষয়ে বস্তুত সম্পূর্ণ উদাসীন এমন কি সৃষ্টিকর্মের পরিপন্থী, সোভিএত সমাজব্যবস্থায় কর্তাব্যক্তিরা হ'য়ে পড়েন সংস্কৃতিঘটিত ব্যাপারে সমধিক উৎসাহী, দায়িত্বভারে সমধিক ব্যস্ত।















কথা উঠতে পারে যে এই সমাজ-ব্যবস্থায় কি ক'রে চর্চিলমার্কা সমাজের নির্বোধ-স্থূল মানস জের টেনে চলে? এই ইউটোপীয় বা কুইকসোটিক প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই মেলে। সোভিএত-সমাজ প্রায় এখন পর্যন্ত চর্চিলমার্কা ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবাদিত্বে বাধ্য, বিকাশের বর্তমান স্তরের তাগিদেই; কাজেই প্রতিবাদ্য জগতের মানস এ জগতকেও স্পর্শ করে। অধিকন্তু, জীবন-যাত্রার উন্নয়নে যে যন্ত্র, যে কৌশল, যে টেকনীক সোভিএত সমাজকে অবলম্বন করতে হয়, সেই যন্ত্রমানসের আদিম অবস্থার জের স্বভাবতই সোভিএত দেশকেও সইতে হয়েছে। ইওরোপে আমরা দেখেছি যে রেনেসান্স বা পণ্যশিল্পের উৎপাদন ও মুনাফার বিপ্লবের যুগ থেকে নবসমাজের প্রয়োজনে এক বিশেষ শিল্পমানস বিকাশ পায়। এই মানসের কীর্তির দীর্ঘ ও বিচিত্র ঐশ্বর্যে আমরা স্বভাবতই ভুলে যাই যে এই মানসটি চিরন্তন বা মানবমনের একমাত্র বৃত্তি বা ধর্ম নয়। মানুষের দীর্ঘ ও বহুবিচিত্র ইতিহাসে এই তিনচার শো বছরের কীর্তি একটি গৌরবময় ও শিক্ষাপ্রদ পর্ব মাত্র। এ যুগোপযোগী ঝোঁক হচ্ছে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকেই ফলাও ক'রে দেখা ও দেখানো; ব্যক্তির নিজের খুঁটিনাটি এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে মিল যে একতা তা নয়, যেটা ভেদ সেই ভেদকেই বড় করা ছিল এ সভ্যতার মানসিক প্রয়োজন। তথা-কথিত বাস্তববাদের জন্ম এই মানসিক প্রয়োজনেই এই উপকরণবাদেই।

অথচ কি সাহিত্যে কি চিত্রশিল্পে মহান শিল্পীরা বরাবরই এই ব্যক্তির আণবিক দৌরাত্ম্য কাটিয়ে ওঠেন এবং তাঁদের সৃষ্টিকার্যে ব্যক্তি হ'য়ে ওঠে মানবিক, নির্বিশেষ, প্রতিভূ, প্রতীক। এবং সমালোচনাতেও এ সত্য দীর্ঘকাল ধ'রে স্পষ্ট, কোলরিজের বিকল্পনা ও সংকল্পনার বিচার কি এই সত্যেরই উপলব্ধি নয়? চিত্রশিল্প জগতেও এ উপলব্ধি দীর্ঘকাল ধ'রে চলেছে। ব্লেকের কথা ছেড়ে দিই, প্রথাসিদ্ধ বাস্তববাদের ওস্তাদেরাও এ সত্য বুঝতেন। তাইতো অ্যাঁগ্র বলেছিলেন যে, মডেল থেকে আঁকলে দাস হ'তে হয়, আঁকতে হয়

প্রকৃতি-দর্শন থেকে নিজের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে। কিংবা গোইআর কথা ভাবা যাক, যিনি বলতেন যে প্রকৃতি থেকে যে শিল্পী নিজেকে সরিয়ে নেন এবং যে সব রূপ ও গতির আন্দোলন তখন পর্যন্ত শুধু কল্পনার জগৎ ছিল তাদের রূপের জগতে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই প্রশংসনীয়। কারণ সত্যই প্রকৃতিতে রংও নেই, রেখাও নেই। অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাই ধরি, দেগা-র কথা ধরা যাক: নর্তকী শুধু তো নক্‌শার একটা অছিলা বা উপলক্ষ্য মাত্র। সব শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে। এমন কি উপন্যাসের মতো প্রত্যক্ষজীবী কর্মেও, চরিত্র, কাহিনী, ঘটনা, বাস্তবতা সবই শুধু উপলক্ষ্য, মূল হচ্ছে লেখকের প্রাণময়তা, যে দুর্বার ছন্দে চরিত্র জীবন্ত হয়, বাস্তব মনে হয়, ঘটনা বা কাহিনী অনিবার্য বেগে চলতে থাকে। বরঞ্চ বলা যায় এই উপলক্ষ্যের মাহাত্ম্যে লেখকের অসুবিধাই, যার জন্য হেন্‌রি জেম্‌সের মতো সমাজবিলাসীও দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন রূপকথার মুক্তির জন্য।

মুস্কিল হয় ঐ উপলক্ষ্যের রহস্যটুকুতেই। কেন নক্‌শার কাজের জন্য লাগে নর্তকীর দেহাভাস? কেন কবিতা লিখতে হয় কথা দিয়ে, শব্দ দিয়ে, এবং সেই শব্দে, সেই কথায় আসে অর্থের দায়ভাগ এবং সে দায়ভাগে জীবনেরই দাবিদাওয়া। এক দিকে জীবন, প্রত্যক্ষ, বাস্তব, পরোক্ষ, ঐতিহ্যগত জীবনের দাবি, জীবনের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব, যার স্বরূপ ও সীমার কোনো সিদ্ধান্ত নেই শেষ নেই। তার উপরে রচয়িতার মন, আয়ত্ত করার ক্ষমতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা। তাছাড়া, জলবায়ুতে যে ভাষার বা শিল্প-প্রকাশরীতির ধারা, সে ধারা সাহায্যও করে আবার টেনেও রাখে। এই বহুধা রহস্যের জন্যই সাধারণ পাঠকের বা দর্শকের সন্দেহ জাগে আধুনিক শিল্পীর বিষয়ে, তার প্রেরণার যাথার্থ্যে, উদ্দেশ্যের সততায়। মনে হয় শুধু বুর্জোআকে চমক দেবার জন্যই বুঝি আধুনিক শিল্পী অভিনব কিছু করবার চেষ্টা করে। একথা ঠিক যে আধুনিক শিল্পী শুদ্ধতার পথে অগ্রগামী, অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীর লক্ষ্য হচ্ছে সেইটুকুই প্রকাশ করা

যা সে মনশ্চক্ষে দেখে, কাণের মরমে শোনে, বোঝে, ভাবে ; তাতে যদি পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের অভ্যাসে আঘাত লাগে তবে সে নাচার। তাই আধুনিক কবিতায় বর্ণনা বা গল্পের আপাতবোধ্যতা থাকে না, ছবিতে মডেলের যথাযথ চেহারা মেলে না, প্রকাশের সততার তাগিদে সংক্ষেপ এসে যায়, মধ্যপদ লোপ পেয়ে যায়, ফিল্মের মতো সংযোজনায় টেলিস্কোপিং হয়।

অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত এই দুয়ের মধ্যে নির্ভয় যোগাযোগে আধুনিক শিল্পীর প্রেরণা অর্জন করে একাধারে তার আন্তরিকতা ও তার বিশিষ্ট আকৃতি। তার প্রেরণার সততাই আধুনিক শিল্পের দুঃসাহসী অভিযানে মূল শক্তি। অনেকে ভাবেন একালের শিল্পীরা, লেখকেরা জোর ক'রে যেন চালাকি ক'রে তাঁদের ধাক্কা দেন। আমার এক বন্ধুর উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করি। তিনি মনে করেন, ধরা যাক্, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এই যোজনা ঐ শ্রেণীর ব্যাপার। কারণ তাঁর কাছে উর্বশী বেদ থেকে, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ, কিন্তু আর্টেমিস্ তাঁর সাহিত্যিক হিঁদুয়ানিতে অপরিচিত লাগে। কথাটা অবশ্য তাঁরই অত্যুক্তি, তিনি বলেন যে গ্রীক বা ইওরোপীয় পুরাণ সাহিত্য শিল্প এমন কি দেবদেবীর নাম তিনি জানেন না, কাজেই ঐশ্বর্যময় প্রতীক উর্বশীর প্রতিপক্ষতায় তাঁর মনে নাকি আসে ঘটোৎকচ —উর্বশী ও ঘটোৎকচ। কিন্তু কবিতাটিতে এবং সেই থেকে বইটির নামকরণে উর্বশী প্রতীকের কেন্দ্রের বিপরীত কাব্যাবেগ দানা বেঁধেছিল আর্টেমিসের রূপে, শুচি কৌমার্যের তনু দেবী, চন্দ্রের হিম-অধিষ্ঠাত্রী, শিকারের দেবতা আর্টেমিসেই। এবং এর জন্য শুধু ইংরেজি কাব্যলোকই যথেষ্ট। তাছাড়া হয়তো ভারতীয়-গ্রীক যোজনাও মনের পিছনে ছিল।

আধুনিক শিল্পীরা এমনিতর সমালোচনায় আজকাল আর কেউ অবাক হন না। কারণ স্বকীয়তার স্বর্ণমারীচ সন্ধানে চমকপ্রদ প্রয়াসে তাঁরা কেউই যে অস্থির নন সে বিষয়ে তাঁরা নিজেরা নিঃসন্দেহ। এমন কি তাঁরা জানেন যে স্বকীয়তার নিত্য বিসর্জনেই, নিজের সামান্যতার সত্ত্বেই

শিল্পের এবং শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের উৎকর্ষ। শিল্পশুদ্ধির সাধনা চিত্ত-শুদ্ধির অনুরূপ, এবং সে গৌরীর তপস্যায় ঋজু একনিষ্ঠতাই কাম্য, ধ্যানের প্রাথমিক কৃশ কঠিনতার ভয় সত্ত্বেও।

তাই পিকাসো আনাতোল জাকফ্স্কিকে আর-দ-ফ্রাঁসে 'মিদিস্ আভেক পিকাসো'-তে বলেছিলেনঃ আমি কিছু খুঁজে বেড়াই না। আমার কাজ শুধু আমার ছবিতে যথাসম্ভব মানবতা এনে দেওয়া। তাতে যদি প্রথাসিদ্ধ মানব-পুত্তলীরা চটেন তাহলে নাচার। তাছাড়া তাঁরা আয়নায় আরেকটু মনোযোগ দিয়ে নিজেদের দেখলেই পারেন।··· তলার দিকে ওই মুখটা কা'র ? ওটা কি কারো ফোটো ? একটা রঙিন মুখোশ ? না ওই হচ্ছে অমুকের মুখ যে ভাবে অমুক আর্টিস্ট মুখটিকে রূপায়িত করেছে ? ও কে সামনের দিকে, মাঝখানে বা পিছন দিকে ? আর বাকিটা কি ? প্রত্যেকেই কি দেখে না নিজের বিশিষ্ট ধরণে ? এখানে বিকৃতির সুযোগ নেই বললেই হয়। দমিএ আর লত্রেক মানুষের মুখ দেখেছিলেন অ্যাংগর বা রেণোআর থেকে ভিন্নভাবে, এইতো ব্যাপার। আর আমি, আমি দেখছি এইভাবে···আসলে আমি যা দেখি তাই শুধু আঁকি। আমি দেখছি, অনুভব করেছি, হয়তো ভিন্নভিন্ন ভাবে আমার জীবনের ভিন্নভিন্ন যুগে, কিন্তু যা আমার দর্শনে বা অনুভবে আসে নি তা আমি কখনই আঁকি নি। একজন আর্টিস্টের আঁকার স্টাইল বা ধরনটা যেন হস্তলিপিবিশারদের জন্য তার লেখার মতো। সেখানে মেলে গোটা মানুষটিকে। আর বাকি যা কিছু সে সব হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাপার, টীকাকার সমালোচকের ব্যাপার, ওসব নিয়ে আর শিল্পীকে মাথা ঘামাতে হয় না।

—প্লাস্টিক কলা কৌশল ? ও আমি বুঝি না। ছবিতে সব কিছুই শুধু একটা চিহ্ন একটা অভিজ্ঞান। সুতরাং যা চিহ্নিত হ'ল সেইটাই মূল্যবান, তার প্রক্রিয়া নয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞান আর শব্দ বা অভিধানের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। যেমন "চেআর" কথাটায় কিছু চিহ্নগুণ নেই। কিন্তু আঁকা হ'লেই "চেআর" হ'য়ে ওঠে একটা অভিজ্ঞান। তখন তার ব্যাখ্যা চলতে পারে অনন্তকাল অবধি। ব্যাপারটা দেশী চলতি

বুলির মতো, যাতে "জিনিষ" বা "যন্ত্র" বললেই মরা শব্দটা ভেঙে গিয়ে অনেক কাব্যগত অর্থ পেয়ে যায়। ঢোকবার পথে তুমি একটা ছবি দেখেছ, যার শিল্পীর নাম আমি বলব না। সত্যিই! ছবিটা খুব খারাপ। অথচ সেজানের হাতে ঐ বিষয়ই ঠিক ঐ ভাবেই প্রয়োগ ক'রে ঠিক ঐ রঙে এঁকেও অতি সুন্দর হয়ে উঠত। কারো হাতে বেরোয় ওস্তাদের কাজ, কারো হাতে কিছুই নয়। সহজে এর ব্যাখ্যা নেই। কোন দুটি রং পাশাপাশি রাখলে বস্তুত তারা গান করে ওঠে? এ কি সত্যি ব্যাখ্যা করা যায়? না। তাইতো ছবি শিখে আঁকা যায় না।

জানতে চাও তরুণদের বিষয়ে আমার কি মত? কিন্তু তরুণ তো অনেক রকম···যৌবনের তো বয়স নেই। এখন অনেক তরুণ রয়েছে যারা কয়েক শো বছর আগে মৃত কোনো কোনো শিল্পীর চেয়েও বৃদ্ধ। অবশ্যই তাদের উচিত তাদের নিজেদের কাল থেকে আরম্ভ করা। আধুনিক শিল্প থেকে, ভালো ক'রে বুঝেসুঝে। মোটরকার যখন হাতের কাছে রয়েছে তখন ঘোড়া বা সাইকেল নিয়ে যাত্রা সুরু করার কোনো যুক্তি নেই। এই অছিলায় যানবাহনের অনেক ফ্যাশন চালু হয় যা আঠার বছর বিশ বছর তিরিশ বছর আগে সার্থক ছিল···সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে যে তারা যা তাদের নিজের ভিতরে আছে তাই দিয়ে কাজ করুক, যা অন্যের নয় বা যা অন্যেরা খুঁজে পেয়েছে তা নয়।

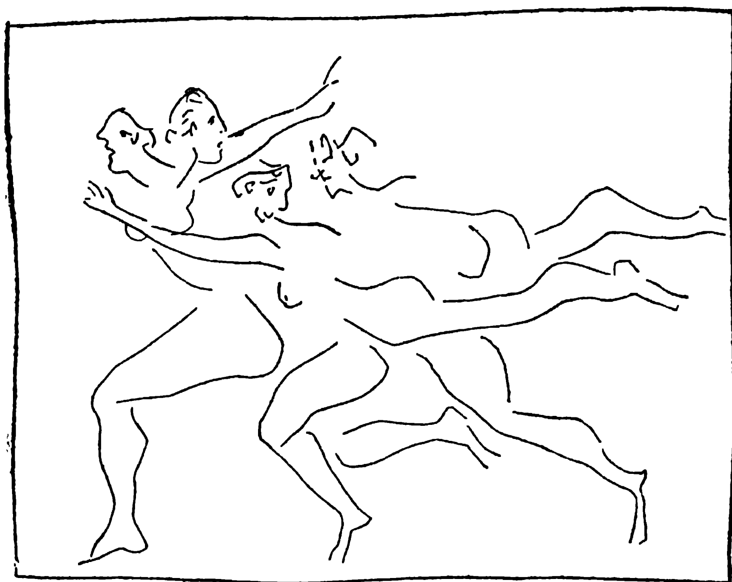
চারুশিল্প-বিদ্যালয়ে যা শেখা যায় তা শুধু হাতের কারিগরি, চিত্রকলা নয়। ঐ ভাবেই তো সাবো (কাঠের জুতা) তৈরি করা শিখতে হয়···তৎসত্ত্বেও ঐ ছাত্রদের কারো তৈরি সাবো কেউ পায়ে প'রে চলতে পারে না।

—এই নক্‌শা দেখ : ওগুলি যে ওরকম হয়েছে তার কারণ এ নয় আমি ওগুলি রীতিবিন্যস্ত ছকে ফেলেছি। ও শুধু নিজেরই বাইরের রূপের চাপে ঐরকম। আমি কোনোদিনই 'প্রকাশের' সন্ধানে ঘুরি নি! স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার জন্য আর কোনো চাবি নেই কবিতা ছাড়া। ···যদি লাইন এবং রূপ মিল পায় এবং পরস্পরকে প্রাণময় ক'রে

তোলে, তাহলে সে তো কাব্যই। তার জন্য অনেক কথার প্রয়োজন নেই। অনেক সময়ে একটা মস্ত লম্বা কবিতার চেয়ে দু'তিন লাইনে কবিত্ব বেশি পাওয়া যায়।

জাকফ্‌স্কি জিজ্ঞাসা করেন: তাহলে আপনার মনে হয় একটি ছবি বা তসবির আর ফ্রেস্কোতে কোনো তফাত নেই?

—না, অবশ্যই নেই। আছে শুধু ভালো আঁকা আর খারাপ আঁকা। আর ছোট আকারে যা সুন্দর হয়ে উঠেছে তাকে আবার বড় করার দরকার কি? মানুষের মহত্ব আসে তার মাত্রাজ্ঞানে, তার আকারে নয়। আর, যা হোক্ ক'রে তাই সাজন করবার ইচ্ছাই বা কেন, যা চিরকাল একই ভাবে রয়েছে?



আঁকা কাগজের দুটি সুবিধা আছে দেয়ালচিত্র বা দেয়ালবস্ত্রের তুলনায়; এতে খরচ কম এবং এ আরো বেশি পালটানো যায়।

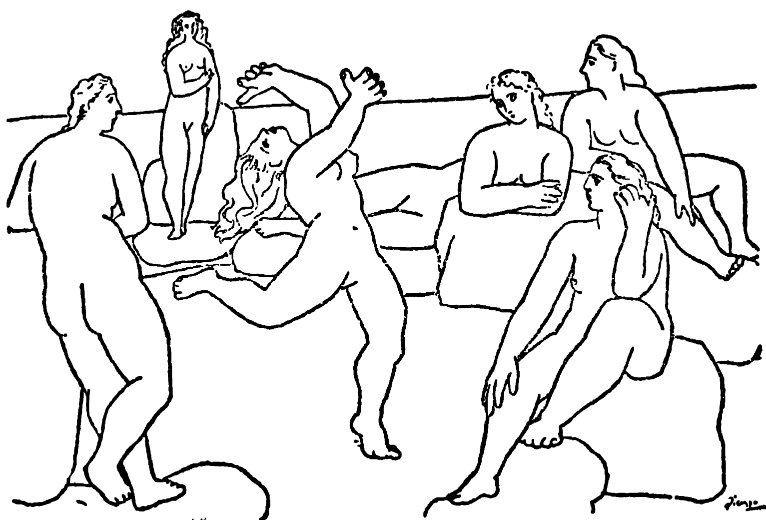
জাকফ্‌স্কির প্রশ্ন: আর একটি প্রশ্ন! আপনার মতে কি আর্টিস্ট ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে?

—হাঁ, অন্তত বর্তমান মুহূর্তে। কিন্তু দোষটা আর্টিস্টেরও নয়, জনসাধারণেরও নয়! জনসাধারণ সাধারণত আধুনিক আর্ট বোঝে না সেটা সত্য, কিন্তু তার কারণ চিত্রকলার কাজ যে কি নিয়ে সে বিষয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। লোককে পড়তে লিখতে শেখানো হয়, আঁকতে গাইতে শেখানো হয়, কিন্তু ছবি কিভাবে দেখতে হয় সেটা শেখানো হয় না। রঙের কবিতা, বস্তুরূপের বা ছন্দের একটা জীবন, সংক্ষেপে বলতে গেলে ঐ প্লাস্টিক মিল যার কথা বলছিলুম—এসব জনসাধারণ একেবারে অবহেলা করে। অবশ্য কাব্যের প্রতীক বা সমস্বর বুঝতেও সে খুব একটা দক্ষ ব্যক্তি নয়। আমার ইচ্ছা যে আমার এনগ্রেভিংগুলির অনেক সংখ্যক কাপি করি যাতে সস্তায় অনেক লোকের কাছে বিক্রি করা যায়। আমি শীঘ্রই বিশেষ ক'রে এই কাজে মন দেব।

পিকাসোর ছবির দুর্বোধ্যতার একটি কারণ তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত বিস্ময়করতা। তাঁর বারো বছরের আঁকা তিনটি পোর্ট্রেটের ছাপাছবি দেখেও বোঝা যায় বালক পিকাসোর অসামান্যতা, যেমন বোঝা যায় প্রবীণ পিকাসোর আঁকা বুফোঁর বই-এর চিত্রাবলীতে। পিকাসোর ছেলেবেলার ছবিতে নেই বালকোচিত অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কোনো বৈশিষ্ট্য, শিশুশোভন সরল কল্পনার পরিবর্তে আছে বৃদ্ধ ওস্তাদের শিল্প-কর্তৃত্ব, নিশ্চিত পেশীর পরিণত শক্তিমত্তা। বৃদ্ধ পিকাসোই বরং শিশুর আশ্চর্য জগৎ স্বকীয় মাহাত্ম্যের কঠিন সারল্যে সৃষ্টি করেন। পিকাসো তাই আমাদের বারে বারে অবাক ক'রে দেন, শিল্পীর গুণাবলীর বিকাশ বা প্রগতি সম্বন্ধে মামুলি ধারণা তাঁর ক্লান্তিহীন শিল্পধারা কেবলই ভেঙে দেয়। এর কারণ পিকাসোর ঐ অবিশ্রাম দৃষ্টিময় বিস্ময়ই, তাঁর বিশ্বের সব কিছুই তিনি সমানে দেখছেন, এই বিচলিত অস্থির বিশ্বে, ভঙ্গুর গতিশীল সমাজে যা কিছু ভাঙাচোরা বাঁকা সোজা সব কিছুই তিনি দেখেন এবং অন্য শিল্পকর্মের মহারথীদের মতোই, রাবেলে, সেরভান্তেস্,

ডিফো, ফীল্ডিং, ডিকেনস্, তলস্তয়, বালজাকের মতোই প্রচণ্ড নিষ্ঠুর দরদী কিন্তু সর্বদাই একনিষ্ঠ এক অন্তর্নিহিত কবিত্বের সততায় রূপায়িত ক'রে যান।

চোখ বুজে বুদ্ধির অন্ধকার ঘরে তিনি বাস্তবকে প্রত্যক্ষকে খুঁজে বেড়ান না, আশ্চর্য এই জীবন তার নানা চেহারায় নানা মেজাজে তাঁর রচয়িতার চোখকে কেবলই ডেকে বেড়ায় এবং তাঁর তৎকালীন তন্ময়তা হ'য়ে ওঠে ধ্যানী; নৈর্ব্যক্তিক, নির্মম বৈজ্ঞানিক মন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো থেকে থেকে রঙীন হ'য়ে ওঠে তার স্বাভাবিক হিস্পানী দরদে বা নিষ্ঠুর



কর্কশতায় আরব, মুর, গ্রীক, রোমক এক ভাবপ্রবণতার কুইক্সোটিক রঙে। পিকাসোর মতে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির পরিণতি অনেক প্রত্যাখানের, অনেক বিসর্জনের যোগফল আর এই জিজ্ঞাসাটা তরুণ শিল্পযাত্রীদের রাখা দরকার। কারণ শিল্পরচনার বিকাশের খাড়াই পথ ক্ষুরধার কাঁটায় পাথরে দুর্গম। শিল্পের সাধনায় প্রথম পথ নাকি প্রেমের, গ্রহণের এবং দ্বিতীয়টি বিতৃষ্ণার, বিরাগের। প্রথমটি এতই সুখকর পথ যে যে অনেক যাত্রীই মাঝপথে অনুরাগের আরামে ঘুমিয়ে পড়ে,

গন্তব্যে আর পৌঁছায় না। কিন্তু ঘৃণার বন্ধুর পথ, রাগের হিংস্র পথ যদি কেউ সাহস ক'রে ধরে, তা'হলে হাতড়ে হাতড়ে শেষ অবধি পৌঁছানো যেতে পারে, অবজ্ঞা নিন্দা কুড়িয়ে শেষ অবধি সে জিততে পারে। সেজান্-ও এই পথই ধ'রে ছিলেন, কিন্তু তিনি কৌতূহল বাদ দেন তাঁর সাধনার টানে, ছোট করতে চান তাঁর বিশ্বকে, ভয়াবহ এই বিশ্বকে। আধুনিক দুঃসাহসে অস্থির পিকাসো, বৈজ্ঞানিকের নির্ভীক নাস্তিক্যে অস্থির পিকাসো, চোখের মনের হাতের বিশ্বব্যাপ্ত জিজ্ঞাসায় সাম্যবাদীর মতো আস্তিক অন্বেষায় বিশ্রামহীন পিকাসোর সময় নেই সেজানের মতো বিষয়তন্ময় মমতার দীর্ঘ ধ্যানের। একালের ভঙ্গুর পশ্চিমা সমাজের চিত্রকর তিনি, তাঁর আসন নিত্য পরিবর্তনশীল, তাঁর প্রতিভার অফুরান বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল রেখে। বুর্জোআ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লীলাভূমি দুর্গত কিন্তু এই প্রাচীন সভ্য দেশের যামিনী রায়ের মতো স্থির কেন্দ্রের রীতিবিন্যস্ত সন্ধান তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

পিকাসো এবারে এলেন মস্কোয়। মস্কোর বুর্জোআতিক্রান্ত জীবনের ধ্যান যদি পিকাসোর অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে আরেক কেন্দ্রিকতার স্থৈর্য দিত, যদি ভাঙন পেত সংগঠনের অনুরাগ, ব্যবচ্ছেদের পরম্পরা হত মমতার পুনর্নিমাণ!

শিল্পের ক্ষেত্রে আবেদনের যে উভমুখ সমস্যা চিরন্তন, সে সমস্যাকে পিকাসোর বৈশিষ্ট্যই অনেকের কাছে আরো কঠিন ক'রে তোলে। কারণ উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি মাত্রই সম্ভব নিতান্ত একটা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বা বোধের ফলে এবং এই নন্দনকার্য নির্ভর করে শিল্পীর ক্ষমতার ব্যক্তিস্বরূপের উপরে এবং সে বৈশিষ্ট্য চালু আইনকানুনের নির্বিশেষ অভ্যাসের গণ্ডী মানে না। ঐ প্রথাসিদ্ধ বা আকাডেমিক আইন, ঐ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক শুধু সীমানাই নির্দিষ্ট করে এবং সবাইকে সে বিষয়ে বাধ্যত সচেতন ক'রে রাখে। ঐ সচেতনতাই হচ্ছে শিল্প-ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাপারটার মুল কথা, এরই সঙ্গে শিল্পীর দর্শনের

তাগিদের হরগৌরী লীলাতেই শিল্পে রূপান্তর ঘটে এবং আসে সার্থক আবেদন। অবশ্য প্রামাণ্যের গাঁটছড়ায় বাঁধা ঐ সামাজিক বস্তুর সঙ্গে শিল্পের সর্বজনবোধ্যতা জড়িত নয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে সর্বজনবোধ্য উৎকর্ষের কোনো দাম নেই, অর্থাৎ গভীর আবেদন নেই সামাজিক অর্থে, আধেয়ের বা কনটেণ্টের অর্থে, যেমন সার্জেণ্টের আঁকা পোর্ট্রেট, যেমন একাডেমির হাজার হাজার ছবি। আবার দেখা যায় সামাজিক অর্থে গভীর শিল্পকার্য হয়তো রূপান্তরের দিক থেকে মোটেই সর্বজনবোধ্য হল না, কারণ সে শিল্পকার্যের যে গুণনীয়ক, যে আধার বা ফর্ম তার নিয়ম সাধারণের অপরিচিত। ফেরনাঁ লেজেরের কাজ এর মহৎ উদাহরণ। পিকাসোর বিচিত্র কর্মশালার মধ্যে এই ধরনের বিস্তর কাজ পাওয়া যায়, যেমন আবার পাওয়া যায় কমবেশি ব্যক্তিগত প্রেরণার বহু শিল্পরচনা। দুরকমের কাজই দুর্বোধ্য লাগতে পারে এবং একই কারণে। তার জন্য দরকার, পিকাসো যা বলেছেন, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা, নিজের কাজ বদলাবার মিথ্যা চেষ্টা নয়।

বিখ্যাত সাম্যবাদী চিত্রকর লেজেরের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ 'সুতরাং কথাটা হচ্ছে এই যোগসূত্র পুনর্বন্ধন করা যায় কি ক'রে। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ কেন আমরা করতে পারছি না? তার জন্য প্রধানত দায়ী তাদের যে অত্যন্ত খারাপ শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ হ'তে হয় সেটাই। শিল্পের বিবর্তন রেনেসান্স ব'লে একটা যুগে এসে পড়ল। তার আগে শিল্পচিত্র গণ্য হ'ত একটা আবিষ্কার, একটা নির্মাণকার্য, কল্পিত বস্তু হিসাবে [যথা রোমানিক ছবি যা মোটেই প্রকৃতির অনুকরণ নয় বা মিশরীয় শিল্পকার্য যা বহুকাল আগেই তার নিজের শিল্পরূপ আবিষ্কার ক'রে বসেছিল]। মধ্যযুগে স্যাঁ-সুলপিসের মূর্তিচর্চা হয় নিঃ হয়েছিল শুধু 'উৎকৃষ্ট বস্তু'র চর্চা, রসজ্ঞসমাজের রুচিজ্ঞানানুসারে নির্ধারিত এবং জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত। ব্যাপারটা পাকিয়ে উঠল রেনেসান্স থেকে। কারণ ইতালীয় রেনেসান্স এল কাপি করার, মানবদেহ অনুকরণ করার চিন্তা নিয়ে। তখন থেকে শিল্প বিচার শুরু হ'ল



জীবন পিকাসো

তুলনা ক'রেঃ যত ভালো নকল তত ভালো।...বেচারা বড় রুসো যিনি নিজে অসামান্য আর্টিস্ট ছিলেন, তিনিও একবার আমায় বলেছিলেনঃ "দাভিদ্ আশ্চর্য জাতের শিল্পী, কিন্তু বুগারোর ক্ষমতা আরো বেশি, দেখছ তাঁর হাতে আঁকা জলের উপরে ছায়া পড়ে কি রকম ?" এ সবই সমাজে চালু শিক্ষাদীক্ষার উপরে নির্ভর করে আর স্কুলকলেজে শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে জঘন্য। মাস্টারেরা শেখায়ঃ রেনেসান্সের কাজ দেখ, ঐ তো শিল্প সভ্যতার চরম ; ঐ তো প্রগতি। যা কিছু ক্ষতি সব এসেছে ঐ ঘোষণা থেকে। শিল্পের ইতিহাসে প্রগতি ব'লে কিছু নেই। মিশরীয় একটি মূর্তি রাফাএলের ছবির মতো, মিকেলাঞ্জেলোর পটের মতোই সমান সুন্দর।...শিল্পে বাস্তববাদ নিরর্থক। পোর্ট্রেট হ'লেই যে আর্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। স্কুলকলেজ নয়, চাই লোকের বাড়ীর সব সংগ্রহ সব মিউসিঅম সাধারণ লোকের আয়ত্তে আসুক। কিন্তু দেখ মিউসিঅম বন্ধ হ'য়ে যায় ছটার সময়ে, ঠিক যখন মজুররা কলকারখানা থেকে ছুটি পায়। মঁসিঅ উইস্‌মাঁ যখন বোজ্-আর সন্ধ্যায় খুলে রাখার ব্যবস্থা করলেন, তখন থেকে তো লোকে ভিড় করে যেতে লাগল।'

লেজের বলেনঃ 'সাধারণ মানুষের দরকার অবকাশ, বাছবার, ভাববার, দেখবার অবসর দরকার। এখনও সাধারণ মানুষের সে সময় নেই, যেটুকু অবকাশ মেলে তাতে লোকে শুধু একটু হয়তো বেশভূষা করতে পারে, স্নান করতে পারে, সিনেমা যেতে পারে, আমাদের কাছে আসতে পারে না। ভেবো না সাধারণ মানুষ এসব ব্যাপার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। সাধারণ মানুষ যখন সাজগোজ করে, তখন সে পছন্দ অপছন্দ বাছাই ক'রেই করে ; এই নীল পিরাণটা বা ঐ লাল শার্টটা সে বাছাই ক'রে পছন্দ করে ; বাছাই করতে সে খানিকটা সময় নেয়। রুচিজ্ঞান তার আছে। দরকার হচ্ছে তাকে এই রুচিজ্ঞান বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া।'

টমাস্ স্ট্যর্ণস্ এলিঅট

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে মৌল প্রভেদ দুশোবছরের রাজদণ্ডের প্রতাপেও ঘোচেনি, সে দুস্তর ব্যবধানবশত সাহিত্যের গৌণ তথ্যের মাহাত্ম্য শুধু সাহিত্যবিচারেই আবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এলিঅট তাই বলাই বাহুল্য মার্কস্‌বাদের মতো সৌরবিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদিনী রাত বটে। মার্কসের পুঁথিপত্রে এল সারা ইওরোপ, ইওরোপের আন্দোলনে এল সারা দুনিয়াই আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে, ভারতবর্ষই এল সেই নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। সেই ব্যাপ্ত বিশ্বের যোগাযোগে সাহিত্যের যে সব কুঠুরি খুলল, তার একটি হচ্ছে কাব্যচর্চার তীব্র শুদ্ধি ও বিজ্ঞানবদ্ধ বোঝবার চেষ্টা। সে চেষ্টায় গত শতকের ইওরোপের, বিশেষত ফ্রান্সের দান নগণ্য নয়।

আশ্চর্যের কথা, আমাদের যে গুরুজন ফরাসী সংস্কৃতির বাংলা স্তম্ভপ্রায়, সেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশ্বেও এই উনিশ শতকের শেষ অর্ধেকের এবং এ শতকের ফ্রান্স প্রায় নেই। বদ্‌লেয়র ও তাঁর অনুবর্তী ফরাসী কাব্যসাধনা; গতিএ, র‍্যাঁবো, মালার্মে, লাফর্গ্, ভালেরি অবধি কাব্যাদর্শের যে বিপ্লবপ্রয়াস—তার প্রভাব এদিকে আমেরিকার এজরা পাউণ্ড এলিঅট থেকে ওদিকে প্রথম বিপ্লবীকবি মায়াকফ্‌স্কি ও পাস্তেরনাক পর্যন্ত প্রসারিত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মহাজনরা এদের বার্তা আনেননি, রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন টেনিসনের ডে প্রফুণ্ডিসের বাণী, প্রমথ চৌধুরী অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের ফ্রান্সের।

এই ইওরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হল দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি এস্ এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা বোধহয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে, যা পরে ছাপা হল

কাব্যের মুক্তি নামে। সেই এলিঅটের প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, মুখ্যত ১৯২৫-এর কবিতাবলী এবং দি সেকরেড উড্ আর ক্রাইটেরিঅন পত্রিকা-সমেত। বিশ শতকের সুখী যদিচ ফাঁপা যুগে প্রায় ঠিক লগ্নেই, বিষিয়ে ওঠার কিছু আগেই; স্নায়ু তখন এক পাহাড়ে চূড়ায়, বেটোফেনের অন্তিম সঙ্গীতের আলোয়, নেতিবাচক পুঙ্খানুপুঙ্খতার আর প্রবল নিরুদ্যমের মুখে। কিন্তু ফল তখনো তিক্ত নয়। অথচ আমরা তখন প্রায় সেই তিমিরেই, আজ যে তিমিরে। নেতির সংযমে শিক্ষা সুরু হল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হল কর্মিষ্ঠ, সচল, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের নির্মাণের। জ্ঞানে হলুম আমরা গেরোনশন থেকে ওএস্টল্যাণ্ড-এ উপনীত। তাই থেকে এল মীরাটযুগে এরিএল কবিতাবলী, ভদ্র অসহযোগের নৈরাশ্যে এল অ্যাশ্ ওএডনেস্‌ডে, যন্ত্রণার মুঠিতে এল আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা।

ব্যাপারটাই নাটুকে—বাংলাদেশে এলিঅট। এই বাংলাদেশের বুকেই—যদিচ এক যুগান্তে, জনযুদ্ধের যুগে—আরেক কবি, সুকুমার তরুণ কিন্তু প্রতিভাসম্ভব ইংরেজ কবি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাথা কোটেন। এলন্ লুইস্ দেখেছিলেন যে ইংরেজ ভারতকে দিয়েছে রুটি নয়, পাথর। বিরোধে তাঁর জর্জর মন তাই ত্রাহি ত্রাহি করেছিল, তাই তাঁর করুণ শেষ হল ব্যর্থ মৃত্যুতে, আরাকানের খদের ধারে দাঁড়িয়ে রিভলভরে নিজের প্রাণদানে। লুইস্ তাই 'ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিআ'র আর্চরকে লেখেন:

'And India is a hard country to mature in. There is so much to anger you in the human scene, so much to dismay you in the social scene, so much to humble you in the universal scene......But what untouched wealth the Indian writer has —if only the climate of the soul was more conducive to a free and deep development of his material. Something seems to have gone wrong out here, and everything is tainted.'

এ বোধ প্রাথমিক বোধ, এ ছাড়া মানসলোকের সেই জলবায়ু হয় না, যাতে কাব্য ও কবির বিকাশ সুযোগ পায়। এই বোধই

ক্লাইভ ব্র্যানসনের পত্রাবলীকে দিয়েছে তার মহৎ মানবমর্যাদা, জুগিয়েছে তাঁর জীবনদর্শনের চিত্রবস্তু। ব্র্যান্‌সনের কাব্যরচনায় কেন ঐ সুস্থ জীবনদর্শন সমাহিত হয়নি, কেন তাঁর কাব্য মামুলি, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মায়া ও সত্তা-র অসামান্য লেখক স্পেনযুদ্ধের বীর কডওএলের স্বকীয় কাব্যের বুর্জোআ রূপবিচারের মধ্যেও এ সমস্যার উভমুখ প্রশ্ন।

এলিঅট আমাদের জানালেন যে কাব্যে বড়ো বিবেচ্য ঐ মানসের জলবায়ু, জানালেন রচনাবস্তুর স্বতন্ত্র ও গভীর বিকাশের বিষয়ে সজ্ঞানতার প্রাথমিক সার্থকতা। সেই প্রস্তুতির ভিত্তিতেই আজ আমরা বলতে পারি লুইসের ভাষায় : Don't you think India has reached the stage, where the lotus becomes as much a 'lie' as the rose in Europe (Mallarme's theory) and there is need for a screeching sweated realism also, as much in the village as in the city. And why is this realism so hard to attain ? The sun teaches it every day.

রৌদ্রের এ অভিযান আরম্ভ যে রাত্রিশেষে, সে রাত্রি আশাভঙ্গের, জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনতার, যে আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। এলিঅটের প্রভাব সেখানে রূপকবৎ, সে রূপক খুল্‌ল গান্ধীজির নীতির গোধূলিতে, রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলাহাওয়ার ধ্যান ধারণায়। সাধারণোই এলিঅট পেলেন সমব্যথী, যদিচ আমরা ছিলুম তখনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। আত্মসচেতনতা ছিল, তবে তখনো সেটা বিচ্ছিন্ন—প্রুফ্রকের মতো। আত্মসচেতনতা তখনো তাই বিড়ম্বনা, বিরহী প্রেমিকের মতো। কিন্তু তা ছিল সৃষ্টিময় ; প্রগতির প্রথম ক্ষেপ, যদিচ হয়তো আত্মসচেতনতা তখনো সেই সম্বন্ধস্বীকারের গভীরতায় পৌঁছয় নি, যেখানে দুঁহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তখনো আমাদের পরোক্ষ ভাবনা স্বভুক্‌, ভালেরির সাপের মতো ; আমাদের আত্মস্থতা তখনো প্রায় হিন্‌ডেন্‌বর্গ জার্মেনিতে রিল্‌কের সুদূরপিয়াসী টিউটনিক আত্মম্ভরী নৈঃসঙ্গ্য কিম্বা ইএট্‌সের মতো তন্ত্রমন্ত্রের রাজারাজড়ার কুহকজালের যন্ত্রণা সম্ভোগ।

এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠ্‌ল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন। ঋণের অন্যান্য দিক এরই জ্ঞাতিসম্পর্কীয়, যথা, বিশেষ কবিতা ভালো কাব্য হয় তখনই যখন তা বিশেষ একটি ভালো কবিতাও বটে। সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার, সে বোধও এলিঅটের সাহায্যে তীব্র হল। তিনি আমাদের সাহিত্য অর্থাৎ এক প্রকার কর্মের বীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন দুইই করেন। অজ্ঞাতসারেই এলিঅটের সমালোচনায় মার্কস্‌ অঙ্গীকৃত, তাঁর কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর আরম্ভ, যদিও হয়তো সে সত্য তিনি জানেন না বা মানেন না।

আরাগঁ-র বিখ্যাত 'এলসার চোখ' নামক কবিতাগ্রন্থের সমালোচনামূলক ভূমিকায় এই সত্য প্রকাশিত। সাম্প্রতিক ফরাসী কাব্যের মুক্তিচেষ্টার পটে তাঁর মুক্তিসন্ধান, ফরাসীকাব্যের ইতিহাসচর্চা কাব্যের ঐতিহ্যে সাম্যবাদী কবির প্রতিরোধ ও প্রেম তাই স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টায় মূল্যবান। আরাগঁ প্রসঙ্গত বলেছেন: 'তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এইই তো মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ। এবং এই মুক্তিতেই, এই প্রকৃত স্বাধীনতাতেই সম্ভব আমার যথাযথতার প্রয়াস, এই দীর্ঘ পথ—প্রায় পঞ্চাশ বছরের—অতিক্রম প্রয়োজন ছিল, বরাবরই এ সমর্থনীয় ছিল, হুগোর হাতে ধ্রুপদী পদ্যের ভাঙাগড়া থেকে প্রতীকীদের মুক্তছন্দ অবধি—ভেরলেনী ভ্রান্তি আর সেইসব মিল বা যমকঘটিত কসরতের পরে।

'এর প্রয়োজন ছিল—মুক্তছন্দের গলিত-দন্ত চিরুনি থেকে অর্ধ শতাব্দীর একশো রকম কাব্যাদর্শের, 'ইলুমিনাসিওঁ'—থেকে সুররেআলিস্ট পর্যন্ত। এবং আজ যখন দেখি দেখি কেউ কেউ অযথা রাজনৈতিক আওয়াজে গত অভিজ্ঞতার এটা কিংবা ওটা বাতিল করেন এবং বলেন

যে আমাদের জাতীয় প্রতিভা শুধু বাঁধা পত্থের সড়কে চলবে তখন আমি হেসে ফেলি, আর যে মূর্খেরা ভাবে, পেড্‌ল দিয়ে পিয়ানো বাজায় তাদের ডেকে বলতে ইচ্ছা হয়ঃ খোকা হাত দিও না। এই দীর্ঘ অভিযান প্রয়োজন ছিল, যাতে আমরা সচেতনভাবে ফরাসী কাব্যের দীর্ঘ ইতিহাস ধরতে পারি, পুনরাবৃত্তির জন্য মুখস্থ বিদ্যায় নয়, কিংবা ডিগ্রী পেতে নয়, ফ্রান্সের একটা গভীর অর্গানিক অনুভূতি আয়ত্তে আনতে। আজকাল যে এই কবিদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত গীতচেতনাকে দাবাবার নির্বোধ ফ্যাশন কোথাও কোথাও চালু হচ্ছে সে ব্যাপারে দুঃখ হয়। এ ফ্যাশনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা আমার কর্তব্য। আমি জানি এখন বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা কথা-দুটো অপব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেন। আমি আস্তাকুঁড় অবধি এ দুটো কথা অনুসরণ করে সম্মানিত হতে চাই। সকলেই যদি যে কর্মক্ষেত্রে যিনি অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ সেই সেই ক্ষেত্রে তাই করেন, তাহলে দুনিয়া জায়গাটার কিছু উন্নতি হয় এবং মূর্খের হাততালি কুড়িয়ে যে সব গাঁওয়ার হাতুড়ে-র মাহাত্ম্য কীর্তন করে, তাদের সংখ্যাও কমে।'

তাই আরাগঁ বলেছেন ঃ 'কাব্যের ইতিহাস তার টেক্‌নীকের ইতিহাস। যারা আমাদের নীরব করতে চায় তারা সেই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লেখক, যারা কিছুই নির্মাণ করে নি, যারা শুধু গোটা কয়েক ছক টেনে প্যাঁচ কষেই ক্ষান্ত হয়। আমি তো আজ অবধি কবিতার প্রতিটি অঙ্গ বিষয়ে না ভেবে, আগের লেখা আর পড়া কাব্যাবলী বিষয়ে সচেতন না হয়ে কোনো কবিতা লিখি নি।'

আরাগঁ বলেন ঃ 'আধুনিক কবিতান্দোলনে আমি এত গভীরভাবে এবং নিজেই অংশগ্রহণ করেছি যে তার সাময়িক রূপগুলিতে ক্লান্ত হয়ে যখন আমি তার দীর্ঘ বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার, লোকোত্তর ভাষার অভিজ্ঞতার সন্ধানে একাগ্র তখন আমার পক্ষে এমন পথ ধরা সম্ভব নয়, যা অন্যের পক্ষে সার্থক হলেও আমার সাহিত্য-সাধনায় পরধর্মী।'

তাই আরাগঁ শেষে বলেছেন যে তাঁর কণ্ঠ রোধ করা যাবে না : 'আমার গান চলবে, সেও তো নিরস্ত্র মানুষের একটা অস্ত্র, কারণ সে মানুষেরই গান, যার পক্ষে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা। আমি গাই কারণ ঝড়ের সে শক্তি নেই যে সে আমার গানকে ডুবিয়ে দেয় আর কাল যদি তোমরা তাই করো, তাহলে আমার প্রাণও নিও কিন্তু গান আমার চল্‌ল অনির্বাণ।'

আরাগঁর কথা তোলার কৈফিয়ৎ দেওয়া বাহুল্য। তাঁরই দেশে প্রায় সত্তর বছর ধরে চলেছে আধুনিক কাব্যের পরীক্ষা, তিনি নিজে বিখ্যাত লেখক, কর্মী, সাংবাদিক, সোভিএতের বাইরে সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে এলুআরের পরে তিনি অন্যতম। কাব্যের স্বকীয় গতি, ইতিহাস এবং আত্মসচেতন কবিস্বরূপের আলোচনা তাই তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিণতি পায়। বাংলা কাব্য অবশ্যই ফরাসী কাব্যের সমগোত্র নয়, তবু প্রগতিশীল সাহিত্য বিচারে তাঁর আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য মূল্যবান।

এ সাক্ষ্য যে পৌঁছল আমাদের সাহিত্যিক অন্তঃপুরে তার কারণ শুধু একবিশ্বে দুনিয়ার সঙ্কোচন নয়, জনযুদ্ধ নয়। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই যে সাহিত্যজগতে আমরা এই পথে আনাগোনা সুরু করেছিলুম অনেক আগেই, ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সমাজে শিল্প ও সাহিত্যের স্থান তার নির্দেশ। এবং উত্তরকালে নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সমালোচক ও কবি এলিঅট।

আরাগঁ বলেছেন কাব্যসাহিত্যে কোনো ডগ্‌মাই প্রযোজ্য নয়। এলিঅটের ডগ্‌মা অবশ্যই আমাদের পক্ষে অগ্রাহ্য। ভৌগোলিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্থূলকারণেই অগ্রাহ্য, আমাদের জীবনে ও জীবিকাতেই এলিঅটের ডগ্‌মার অসারতা স্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য স্বীকার্য। আমাদের পিতা-পিতামহেরা সাহিত্য বলতে বুঝতেন মিলটন্, শেক্‌সপিঅর এবং তাও এলিজাবিথান্ জগত থেকে বিচ্যুত একক শেক্‌সপিঅর এবং শুধু উনিশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্য। মাইকেল অবশ্য ইওরোপীয় পটও চিনতেন,

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় জগতে বিচরণ করতেন, তবু মোটামুটি অগ্রজেরা কাব্যজিজ্ঞাসাকে সীমাবদ্ধই রেখেছিলেন। উনিশ-শতকের আগে ও শেষ দিকে এবং ইংলণ্ডের বাইরে তেয়ন্ ও আমিএল ছাড়া যে ইওরোপ ছিল সে বিষয়ে যথোচিত চর্চার সুযোগ সেকালে ছিল না! অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের বিরাট স্বয়ম্ভুর প্রতিভার বিচার এ প্রসঙ্গে উঠছে না।

ইংরেজি, ইওরোপীয় এবং আমাদের নিজেদেরই সাহিত্যের ঐতিহ্য সন্ধানে তাই এলিঅটের নিদর্শন শ্রদ্ধেয়। এবং এ সন্ধান এক রকম নির্মাণ, কর্মিষ্ঠ পরিবর্তন, একথা এলিঅটই অত ভালো করে সাহিত্য-প্রসঙ্গে বলেন প্রথমে। আরাগঁ যখন সেই কথা আজ বলেন তখন আমরা প্রস্তুত থাকি এই মার্ক্সীয় প্রস্তাবের জন্যে। কারণ কথাটা মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌সেই সম্পুর্ণ, যান্ত্রিকতা বা আদর্শবাদ কোনোটাতেই নয়।

তাই পটভূমি ভিন্ন হলেও এলিঅটের অভিজ্ঞতার তুল্য মেলে আমাদের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মূল্যনির্ধারণ বাদ দিয়েই বলা যায়। এক হিসেবে আমাদের সুবিধাও আছে ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায়। ঘোর দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে গিয়েও ভারতীয় জীবনে এখনো একটা বিস্তৃত অপিচ স্থুল ঐতিহ্য আছে, সোফিস্টিকেশন বা জীবনচর্চার একটা সভ্য কিন্তু লৌকিক ঐতিহ্য। এল্‌উইনের ছত্তিশগড়ী গানে তার প্রমাণ। অবশ্যই সে ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় মেলে না, সে ঐতিহ্যব্যবহারের পথ আপাতসহজ নাও হতে পারে, এবং সে বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তুল্য-মূল্যও নয়।

সংস্কৃত ব্রহ্মণ্য ও দেশজ সংস্কৃতির যোগাযোগে দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে নানা যুগে নানাভাবে তার নানা রূপ খুলেছে। অনেক সময়ে অবশ্য সে রূপ অভ্যাসের সহজ সংকেতিত মার্গে পড়ে ছকে পরিণত হয়েছে। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ অভ্যাসিকতার পাঁচিল ভেঙে আমাদের মুক্তি দিলেন। এলিঅটের সীমাবদ্ধ সার্থকতা ও ব্যর্থতার করুণ নিদর্শনে বুঝলুম ঐ

প্রাচীরের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, রূপায়ণের দ্বন্দ্ব; অর্থাৎ শিখলুম ঐ মুক্তিকে ব্যবহার করতে, ধারাবহ করতে।

এলিঅটের নির্দিষ্ট দান সার্থক তাই রামমোহনের ঐতিহ্যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা ও পুরুষার্থের গণ্ডী বিস্তারে এবং তারই সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রতর করায়। অর্থাৎ নিজেদের ও বিশ্বের বিষয়ে আমাদের চৈতন্য ক্ষুরধার করায় অবস্থাটা করুণ বা বীরত্বব্যঞ্জক—যে দৃষ্টিতে দেখি। বীরত্বের দিকটাই আমাদের কাছে মহার্ঘ—সন্ধানের, নির্মাণের কর্মিষ্ঠ দিকই।

তাই আমরা বুঝলুম যে কবিতা একটি বিশেষ কাব্যবস্তু এবং বিশেষ কাব্যবস্তু আর প্রক্রিয়া দুইই। বুঝলুম যে এই প্রক্রিয়ায় চাই যথাসম্ভব চিত্তশুদ্ধি; এ বিন্যাসে এমন কি প্রত্যক্ষ লিখনকর্মের ব্যাপারেও। আবার এও জানলুম যে শুদ্ধকাব্য প্রযুক্ত হতে পারে অশুদ্ধভাবে, যেমন যে কবিতা প্রক্রিয়ায় রূপায়ণে সৎ, তার প্রয়োগ হতে পারে কাব্যের বাইরেও। প্রায় ক্রোচের মতো পাঠক হয়ে উঠলুম আমরা, দান্তের ক্রোচের মত। এবং মার্কস্ এঙ্গেলসের শেক্সপিঅর, বালজাক, গয়টে, হায়নে কিম্বা ইবসেন বিচার বোধ্য হল আমাদের কাছে।

তাই এলিঅটের সব কবিতার অনুবাদ ঘটনে বাধা থাকলেও তার রীতি আমাদের সহায় এমন কি তার কবিতার অলঙ্কার অঙ্গবিন্যাস, জগৎ ভিন্ন হলেও। কাব্যের মুক্তির চেতনায় ফল হয়েছে এই। প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই রাজর্ষিদের যাত্রার মতো ক্রিস্টিয়ান কবিতা গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়, কোরিওলান পায় ইন্‌টেরিম সরকারের কালে, গেরোনশন হঠাৎ এসে যায় অবলম্বনঅনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতার উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়। তাছাড়া, এই প্রভাব বা তুল্যমানসের প্রসার আজও চলছে। আজই হয়তো সে প্রসারের

সীমা স্পষ্ট—বুদ্ধদেব বসুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক বন্ধুরাও আজকাল বলছেন পরিশ্রমী ও আত্মসচেতন কাব্যসাধনার কথা এবং ওদিকে ইতিমধ্যে কমলবন পরিক্রান্ত আর গোলাপের রহস্য আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। আর প্রতীক্ষা করছি তীব্র স্বেদাক্ত প্রত্যক্ষবাদের।

এলিঅটকে তাই আমরা আজ প্রকৃতই সাবালক শ্রদ্ধানিবেদন করতে পারি তাঁর ষাটবছরের জন্মদিনে, ভিন্‌গায়ের ভিন্নধর্মী খুড়ো-মেসোর মতো।

প্রমথ চৌধুরী ও আমরা

প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' এবং অন্যান্য বইগুলি প্রকাশ করার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়কে ধন্যবাদ। প্রমথবাবুর অনেক রচনাই বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন, আশা করা যায় তাঁর অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য রচনাগুলিও তাঁরা ভবিষ্যতে প্রকাশ করবেন। কারণ রচনার সুখপাঠ্যতায় ও শুভবুদ্ধির চর্চায় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আজও আমাদের মনোযোগের ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁর প্রয়োজন আজও সমধিক বর্তমান। আমাদের দুশো বছরের ইতিহাসে নানা বাধাবিপত্তির কারণে যে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতা এখনও শিক্ষিত শ্রেণীকে অবনত রেখেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযানে যেমন ঐতিহাসিক কার্যকারণ নির্দেশ ও প্রয়োগবিস্তার মূল্যবান, তেমনি এই চলিত দুরবস্থার মধ্যেই যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের লেখা অধ্যয়নও বুদ্ধির পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় ও রুচির স্বাস্থ্যসন্ধানে বিশেষ সহায়। প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী এই সভ্যতার চর্চায় তাই এত মূল্যবান। ভূত, ভগবান, ভালবাসা মানেন না এমন কল্লোল-মার্কা কথা তিনি কৈশোরেও বলেননি, তাই প্রবীণ বয়সেও শুধু নির্বিশেষ মানুষকেই তিনি পরমপুরুষ ভাবতেন। মৌতাত তিনি ঈশ্বরে খোঁজেন নি, তাতানো শূন্যের কংগ্রেসেও না, তাই ইআংকি ডুড্‌লকে নিয়েও তাঁকে মাততে হয় নি।

অবশ্য এই যুক্তিনির্ভরতা স্থানকালপাত্রে অসম্পূর্ণ থাকতেই পারে। সে কথা স্মরণে রাখতে নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু যদি আধাবুর্জোআ, বা এক-প্রকার লুম্পেন্-বুর্জোআই আমাদের দুর্গত পটভূমির কথা ভাবা যায় তাহলে প্রমথ চৌধুরীর কীর্তিই হয়ে ওঠে প্রধান বিবেচ্য। তাঁর সমসাময়িক কেন, অতীতের বুর্জোআ ইওরোপের বুদ্ধিচর্চার মান প্রমথ চৌধুরীর প্রায় একক চেষ্টার তথা বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিলবে না।

এবং একই ঐতিহাসিক কারণে, যার জন্য প্রমথবাবু দায়ী তো ননই, বরঞ্চ এদেশের মধ্যবিত্তের দায়ভাগের ভুক্তভোগী মাত্র। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই দুর্ভোগ রবীন্দ্রনাথেরও বিরাট ও তীব্র প্রতিভার স্বরূপ ও তার শতরূপ প্রকাশকে বিড়ম্বিত করেছে; যার জন্য সেই মহাকবির স্বজাতি তাঁকে আজও জাতীয় সত্তার কবি হিসেবে পেলনা, গ্রীস যেমন পেয়েছিল হোমরকে, রাশিয়া যেমন পেয়েছে সেকালের অসম্পূর্ণ কবি পুশকিনকে আজকের সম্পূরণের জাতীয় কবিরূপে।

এরই ফলে প্রমথ চৌধুরীরও থেকে থেকে পদস্খলন হয়, তাঁর ক্ষিপ্র বাকচাতুর্য হয়ে যায় অগভীর রসিকতা মাত্র। ভারতচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ চৌধুরীই, বাদশাহী বীরবলের মতো বাংলার গোপালভাঁড়ও তো তাঁর স্বদেশের, তাই তিনি 'বীরবলের হালখাতা'য় লিখে ফেলেন: তোমরা বিয়ে করো, আমাদের বিয়ে হয়। অত্যন্ত বাস্তব ও গভীর চিন্তার মধ্যেও এই রকম মনোরঞ্জন চেষ্টা প্রমথ চৌধুরীর মতো দুর্লভ সহৃদয়তা ও মননশীলতার মধ্যে কি করে আসে তার ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু খানিকটা যে আসে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অজ্ঞতার ঢাকনা ভারিক্কি ভাবের ও ভাষার প্রতিবাদেই তাতে সন্দেহ নেই।

এরই জন্য হয়তো প্রমথবাবুর একটা বাঁকা প্রভাব বর্তমান বই-এর বাজারে অর্থবান হয়ে উঠেছে ব'লে শোনা যায়; তার কিছু, যাকে বলে আরামকূজন বা রম্যরচনা নামে এক বস্তু, কিছু বা আধা গালগল্প বা দেশ-বিদেশের কল্প-কাহিনী। এসব সাহিত্যের অর্থাৎ ছাপা বই-এর বাজারদর হচ্ছে সেটা ভাল কথা। কিন্তু 'চার-ইয়ারি কথা'র মতো অশরীরী গল্প আজও আবার পড়লে যেটুকু তৃপ্তি হয় তার বা তাঁর 'গল্প সংগ্রহ'র ধারের তুলনা একালের শ্রেষ্ঠ-পসারী বইয়ে কোথায়? তাঁর অনেক প্রবন্ধেও ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্গোক্তিতে বক্তব্য পাঠককে যে আঘাত করে, সে আঘাত গভীর হৃদয় ও সজাগবুদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়; এবং ঐ স্তরের হৃদয় বুদ্ধি দুর্লভ। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তাছাড়া প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি-বিচারে বা বাংলা সংস্কৃতির নির্মাণের চেষ্টায় তাঁর চাতুর্যের এই তথাকথিত প্রভাব গৌণ প্রশ্ন। সজ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যাচর্চার মাহাত্ম্যবোধই প্রমথ চৌধুরীর মুখ্য দান, সাম্প্রতিক স্মার্টমন্যতা বা বয়স্ক ছেলেমানুষীর চালিয়াৎ খেলা নয়।

অবশ্য সেখানেও ঐ ঐতিহাসিক কারণেই প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা মাঝে মাঝে খণ্ডিত হয়। তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মনন ঘুলিয়ে ওঠে, তখন তিনি তাঁর নিজেরই কথার উল্টো বুলি বলেন; রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনায় ভুলে যান যে ইংরেজ ও ইংরেজের শেখানো কিছু লোক ছাড়াও বাংলা দেশে আরো মানুষ ছিল ও আছে; তখন তাঁর মনে হয়ঃ বাঙালী জাতির জন্ম তারিখ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ। অথচ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'র একাধিক প্রবন্ধ, 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' বা 'হিন্দু-সংগীত' একথার মূর্ত প্রতিবাদ।

দেশজ অতীতের দিকে ও দেশের সাধারণ মানুষের দিকে, তাঁরই কথায়, রায়তের দিকে তাঁর মনন অগ্রগণ্য ও কার্যকর হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সময়ের দেশের চৈতন্য আমাদের খণ্ডিত সমাজে তাঁর মতো অতি উচ্চ শিক্ষিত মনীষাকে বাধ্যতই দূর থেকে ছুঁয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত অর্থাৎ অর্ধশিক্ষিত তাঁর সমাজ তাঁকে মুক্তি দেয় নি। এবং ফলে এই সীমায়ন ব্যাপারটা যে শুধু দেশীয় আলোচনার ক্ষেত্রে নয় তার প্রমাণ তাঁর ফরাসী সাহিত্য চর্চা। ও বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ সুখপাঠ্য এবং বাঙালী পাঠকের পক্ষে সাহায্যকর প্রবন্ধটি ইংরেজি পড়া ছাত্রদের যে কোনো বই, যথা হোম য়ুনিভার্সিটির 'ফরাসী সাহিত্যের পথের নিশানা'র পরে শুধু যে অগভীর লাগে তা নয়, মনে হয় আঠারো শতকের পরে প্রমথবাবুর কাছে ফরাসী সাহিত্যের যাথার্থ্য ছিল না। অথচ জ্ঞান তাঁর ছিল, অন্তত গুতিএর তিনি ভক্ত ছিলেন। এই লঘুক্রিয়া কি বাংলা সংস্কৃতির প্রাদেশিকতার জলবায়ুর জন্যই ঘটে? না হলে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানব, ইওরোপ যাঁর বহুপরিচিত, তাঁর রচনাতেও কেন ইওরোপ

এত কম প্রকাশ পায়? মনে হয়, আমিএল, একটু বা গয়টের আলোক-প্রার্থনা, টেনিসনের ডে প্রফুণ্ডিস, মূরের মেলডিস্, একটু বা হুগো বা ওঅট্সনের শরতেই তাঁর ইওরোপের পরিচয় নিঃশেষ? সেই জন্যই কি একালে ইওরোপবিহারী বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন যে তিনি কাব্যে মালার্মেপন্থী? যদিচ উনিশ শতকের ফরাসী মালার্মের পন্থা একরকম মন্ত্রবাদের, স্বপ্নপূজার পন্থা, যাতে ধ্বনি মন্ত্রের ইন্দ্রজাল বা সঙ্গীত যোজনার অনিবর্চনীয়তার বা অশেষ রেশের মধ্যে দিয়ে বস্তুর রূপায়ণে স্পষ্ট এবং বাংলায় ঝোঁক যায় প্রতীকের কুহকে বা সঙ্গীতময়তার মধ্যে দিয়ে বস্তু রূপায়ণে ততটা নয় যতটা শব্দের প্রত্যক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিধার দিকে।

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনাটুকু শ্রদ্ধা নিবেদনেরই নির্দেশ। কারণ আমাদের এই মহাজন গত শতাব্দীর মহাপুরুষদেরই পরিপূরক। তাঁর কালে ভগীরথের পথ হয়েছে কখনো সৌখীন, কখনো দুর্গম, কখনো বা তির্যক বন্ধুর। তাই গত শতকের বিদ্যাসাগরের মহৎ শুভবুদ্ধির গম্ভীর অনুকম্পা, দীনবন্ধুর বা কালীপ্রসন্নের সমব্যথী ব্যঙ্গ, বঙ্কিমের অনিশ্চিত কিন্তু প্রথম বয়সের আন্তরিক চেষ্টা, বা মাইকেলের অন্তরঙ্গ ইওরোপীয় বিদ্যা একালে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের স্বয়ম্ভর প্রতিভার তৃপ্তিহীন ব্যাপ্তি আজকের পটে, আমাদের দারিদ্র্য, মুর্খতা, দাসত্বের মধ্যে আকাশের মতো মনোরম কিন্তু দূর। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদী আয়াসসাধ্য মানবিকতা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে একান্ত মূল্যবান। প্রমথ চৌধুরীই লিখেছিলেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রজার অবস্থা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রায়তকে যে অবস্থায় আমরা রেখেছি, তার ফল ত্রিবিধ—দারিদ্র্য মূর্খতা দাসত্ব। তিনি আরও বলেন যে—

ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্বলাভ করিতে উন্মুখ হয়।'

অবশ্য প্রমথ চৌধুরীও জানতেন যে: 'যে প্রজার অধিকারের কথা

তোলে, কারও মতে সে বলশেভিক, কারও মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।'

কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে ছিল যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। তাই 'রায়তের কথা'র উপসংহার এই ব'লে:

'তিনি আরও বলেন—

এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জান?—ইংরেজিতে যাকে বলে কম্যুনাল প্রপার্টি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant proprietor না করে তুলি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশিদিন লাগবে না।"

বিদ্যাসাগরের বাংলার ইতিহাসে যে অবিচারের বিষয়ে স্বল্পবাক্ ধ্রুপদী আভাস আছে, এবং যার স্বরূপ বঙ্কিমের নবীন আদর্শবাদের চক্ষে স্পষ্ট হয়েছিল, প্রমথ চৌধুরীরই পুস্তিকায় বাংলার সমাজ ও তার ফলে সংস্কৃতির সেই মূল প্রশ্ন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিস্ময়কর ভাবে আলোচিত হয়েছিল। তারপরে যা হয়েছে তা খুবই সাম্প্রতিক এবং স্বল্প, এক "সাহিত্যপত্র"-তেই এ প্রসঙ্গে যা কিছু আলোচনা দেখা যায়।

আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড

আমাদের বর্তমান জীবন বুঝতে গেলেও সাবেক সমাজবিন্যাসের ইতিহাস অবশ্য আলোচ্য। দুঃখের বিষয় এই ইতিহাস আজও পুরো জানা যাচ্ছে না, কি তত্ত্বে কি তথ্যে। আর এই ইতিহাস এত দীর্ঘকালব্যাপী এবং এত বিরাট ভুখণ্ডের এত রকম লোকসমাজ এর উপজীব্য যে সংক্ষেপে এবং আন্দাজে কিছু নির্ধারণ করাও অর্থহীন। অবশ্য মাঝে মাঝে পণ্ডিতব্যক্তিরা নতুন জ্ঞান পরিবেশন করেন।

অধ্যাপক কোশাম্বীর রচনা কমই দেখা যায় কিন্তু তাঁর লেখা সর্বদাই চিন্তাশীল এবং আমাদের পাণ্ডিত্যের ভারিক্কি জগতে তাঁর মননের উদ্ধত জৌলুষ একটা বিস্ময়কর আরাম। এইরকম মুখরোচক লেগেছিল কিছুকাল আগে আর্য বিষয়ে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের মহারাষ্ট্রীয় ইতি-বিলাস। কিছুকাল হল, ইন্দোসোভিএত সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পত্রিকাতে কোশাম্বী একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। অবশ্য উক্ত পত্রিকাতে স্তালিন বিষয়ে যুক্তিহীন রূঢ়তা প্রকাশ কোশাম্বীর বা পত্রিকার পরিচালকদের রুচি বা শুভবুদ্ধির পরিচয় দেয় না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক বলেছেন : ভারতেতিহাসে উন্নতির মূল পর্ব হচ্ছে নাগরিক কিন্তু স্থাণু সিন্ধুসভ্যতা, এরই ছাপ পরের টেক্‌নীকে, প্রতিমাবর্ণনে বা আইকনগ্রাফিতে, এবং সম্ভবত সামাজিক বিধিব্যবস্থাতেও।

দুঃখের বিষয় এই সমাজের উন্নতির পর্বগুলির পরম্পরা বা স্বরূপ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং সে জ্ঞান কোশাম্বী কিছু বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নি। তাছাড়া, এই উন্নতির আগের অবস্থার বিষয়েও তিনি নীরব। ফলে, আমরা, আমাদের অতীত শিকড়ের সন্ধানী সাধারণ ভারতীয় পাঠকরা না জানি এই উন্নতির উৎস, না

জানি টেক্‌নীকে বা সমাজে এর ছাপের প্রকৃতি। কি ক'রে যে এই সভ্যতা নাগরিক এবং স্থাণু অবস্থায় পরিণত হল সে বিষয়ে কোশাম্বীর নীরবতায় মনে হতে পারে যে বিকাশ-সমস্যা বাদ দিয়েও কোনো সভ্যতা একেবারে পরিণত অবস্থায় পৌঁছায়; বলাই বাহুল্য সেটা ভুল হবে। বিকাশের এ পূর্বাপর নিয়মের কথা ছাড়াও আরেক বিষয় আমাদের জানা দরকার; এই যে মাথাভারি নড়বড়ে নগরসভ্যতা, মহেনজোদারো বা হারাপ্পাই ধরা যাক্, এর তো একটা গ্রামীন জোড় বা গ্রামের অর্থবহ শাখার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যিক; এবং আম্‌রি, নাল্, কুল্লী ইত্যাদির পুরাতত্ত্বের জ্ঞান তা সমর্থনই করবে। এ প্রশ্নের উত্তরের তথ্য হয়তো কম কিন্তু ইতিহাসতত্ত্বে এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকে ভারতের ভূগোল ঘটিত তাৎপর্যও কোশাম্বী বোঝেন নি। কৃষি কি সেকালে লোকের পক্ষে অতিপর্যাপ্ত ছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের সম্বন্ধে ভারমাত্রার অসাম্য ঘটেছিল কতটা এই ভূমির পর্যাপ্তির জন্য? তারপরে, সমস্যা থেকে যায় যাতায়াত ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা এবং তজ্জনিত প্রাথমিক উৎপাদক এবং পণ্যবিক্রেতার মধ্যে কোনো জীবন্ত গতিশীল এবং পারস্পরিক ভাবে সার্থক সম্বন্ধপাতের অভাব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায় ভূমির ভৌগোলিক বিস্তার, তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তাৎপর্য একটা বড় বিবেচ্য। এই ভূমির প্রভাব ইতিহাসকে ভালোই হোক মন্দই হোক এক বিশেষ চেহারা দিয়েছে; এ দিকে সজাগ থাকলে কোশাম্বীর মতো সুপ্রস্তুত পণ্ডিত তথাকথিত এশিয়াটিক রহস্যের দিক নির্ণয় করতে পারতেন।

দ্বিতীয় বিবেচ্য নিশ্চয়ই বৃহৎ সমাজের মধ্যেই নিহিত বিরোধসমষ্টি; গ্রামীন ও নাগরিক আর্যপূর্ব সমাজে, আর্যেরই মধ্যে, আর্য ও আর্যেতরে এবং তারপরে আর্য ক্ষমতারই নতুন বিন্যাসের মধ্যেই। এটা মনে না রাখলে আমাদের ইতিহাসের ধারায় বিরোধের, বিজয়ের এবং আপোষের, বিদ্রোহের ও পুনর্ব্যবস্থার এবং শেষ পর্যন্ত স্থাণুতার ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। মনে রাখলে বোঝা যায় কেন বাণিজ্যিক

বিকাশের পথে আদিম বৌদ্ধযুগে বা অশোক সাম্রাজ্যে কিংবা বহুপরে মুঘলযুগেই ধরা যাক্—বারবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু এদেশে সৌখীন শিল্পের আশ্চর্য বিকাশ হলেও ইওরোপের সমতুল্য কৃষিবিপ্লব বা পণ্য বিপ্লব হয় নি ; গ্রীকোরোমক, মধ্যযুগ বা নবজাগরণেরও তাই এ দেশে যথার্থ তুল্য কিছু নেই। আর্যের পরোক্ষধর্মী আধিভৌতিক ধ্যানধারণা এবং অন্যপক্ষে লৌকিক পুরাণ বা মিথগুলির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রকৃতি কি ভাবে হিন্দুসংস্কৃতিতে এখানে-ওখানে কমবেশি মিশ্রিত হল, এ দৃষ্টিতে সে বিষয়ে আলোকপাতেও সাহায্য হয়।

ভারতেতিহাসের এবং তার দায়ভাগের উপরে মার্কসের শ্যেনদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়েছিল তার এই বিরোধী স্বভাব, ভারতের গ্রাম্য সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষ এবং ভয়াবহ রুদ্ধতার দীর্ঘ আয়ু।

সময়ে সময়ে প্রত্যাগতির দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, আমাদের অনেক আদিমগণের পুরাণে মেলে এই সভ্যতা থেকে আত্মরক্ষার জঙ্গলে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। একদা যদি সিন্ধুসভ্যতার সমগোত্র মানুষের সঙ্গে কিছু কিছু আদিবাসীগণের .পূর্বপুরুষদের আত্মীয়তার খবর পাওয়া যায়, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং তখনই দাক্ষিণাত্যও ভারতেতিহাসের মানচিত্রে যথার্থ মর্যাদা পাবে।

এই ভূমির স্থান ও জীবনযাত্রার কালের ব্যাপ্তির বিষয়ে উদাসীন অধ্যাপক তাই ভারতীয় আর্য শাসকদের বলেছেন প্যাস্টরল নোমাডিক ট্রাইবল ব্যবস্থা অর্থাৎ পশুপালক যাযাবর গণসমাজব্যবস্থা। পরমুহূর্তে তিনি স্থান কাল পাত্র ভেদ না রেখে এই ব্যবস্থাকে চতুর্বর্ণ শ্রেণীতে পর্যবসিত এবং নতুন দেশে পত্তনরত দেখছেন। এর আগেই কোশাম্বী তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতার মধ্যের স্ববিরোধকে উড়িয়ে দিয়েছেন, ফলে, মনে হয় যেন সিন্ধুযুগে শুধু নগরই ছিল এবং সমকালীন বনবাসীগণ ছিল না। তেমনি কোশাম্বীকাণ্ডে আগন্তুক আর্য এবং অনার্যের মধ্যে, পরের বিস্তৃততর আর্য উচ্চনীচবাদী সমাজের অন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাগের মধ্যে বিরোধী এবং বলপ্রয়োজক সম্বন্ধপাতের নির্ণয়ও গৌণ।

অবশ্য কোশাম্বীর পরোক্ষ ঝোঁক ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে পুষ্টি পেয়েছে।

ভারতের ইতিহাসের পরের যুগকে কোশাম্বী বলেছেন ইওরোপের সমতুল্য পিওর ফিউডালিজম্। তাঁর অভিজ্ঞা শব্দের ব্যাখ্যা তিনি দেন নি, সম্ভবত কোশাম্বী বিশুদ্ধ সামন্ততন্ত্র বলতে বোঝেন পশ্চিমা একপক্ষে ম্যানরিঅল প্রজা ভিলেনেজ এবং অন্যপক্ষে ক্রমবর্ধিষ্ণু নগর —গিল্ড কারুসঙ্ঘ। তিনি কি শার্লমানের সমাজব্যবস্থার কথা বলছেন? নাকি বাইজান্টীয় রাজন্যপ্রধান সমাজব্যবস্থার?

ইওরোপের ইতিহাসে সার্থক নামশব্দ তিনি ব্যবহার করেন কিন্তু তার ভারতীয় ভেদে প্রতিশব্দ ব্যাখ্যা করেন না, ফলে সাধারণ পাঠক আমরা উদ্‌ভ্রান্ত। অশুদ্ধ ফিউডালিজম বস্তুটা কি? ভারতের কি সে ভূমিব্যবস্থা ছিল, যার ভিত্তিতে এখানে শুদ্ধ ফিউডালিজম্ উঠবে?

প্রাচীন ভারতের আর্যীকরণের এ কোশাম্বীকৃত ছবি পরোক্ষধর্মী ব'লে ভূখণ্ড এবং কালের গতির বিষয়ে দুর্বল তো হবেই। তাঁর আর্য বিষয়ে প্রত্যেকটি নাম প্রয়োগে আর্যরা অত্যন্ত বিশিষ্ট হলেও তিনি তাই বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বলেছেন:—আর্যরা জাতি নয়। নাৎসি জাতিমাহাত্ম্য আর সনাতন হিন্দুত্বের সংশোধক হিসাবে মন্তব্যটি নিশ্চয়ই সাধু। কিন্তু তারপরে তিনিই আবার বলেন যে ঐ আর্যরা এক স্বতন্ত্র, নৃতাত্ত্বিক অর্থে জাতি বা দল বিশেষ, তাদের ভাষা ভিন্ন, তাদের অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থা ভিন্ন, তারা অন্তত সিন্ধু-সভ্যতার বা অনুরূপ নাগরিক সমাজের লোক নয়, বরং এ সভ্যতা তারা ধ্বংস করেছিল এবং তারা আর্যপূর্ব আরণ্যকও নয়।

কোশাম্বীর চেষ্টা ভারতীয় সমাজের বিরোধকে গৌণ করা, তাই তিনি আর্যের জাতিহরণ করতেও দ্বিধা করেন নি এবং শেষ পর্যন্ত অতীন্দ্রিয় ধর্মেই তাঁর মার্কসের চেয়েও মার্কস্‌বাদী দর্শনের মুক্তি। তিনি বলেন মার্কসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত উপমা এশিয়াটিক ফিউডালিজমের মূল সূত্র হচ্ছে এশিয়াটিক ধর্মে। দুঃখের বিষয় এই এশিয়াটিক ধর্মেও তাঁর

সমস্যার সমাধান মেলে না। এমন কি দুটি এশিয়াটিক দেশ ভারত ও চীনের সমাজব্যবস্থার প্রভেদও এই এশিয়াটিক ধর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

তার চেয়ে বড় কথা, কোশাম্বী ভুলে যান যে ধর্মও কিছু একটা অনাদ্যন্ত মৌলিক বস্তু নয়, ধর্মও সমাজজীবনের নক্ষত্রবিন্যাস মাত্র। সেই জন্যই ভারতের বর্ণজাতিনির্ভর ধর্ম ও মান্দারিনপ্রধান চীনের ধর্ম ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে অনেক নৈকট্য থাকলেও।

অবশ্য কোশাম্বী বারবার বাস্তব জীবনের তথ্যের মুখোমুখি হবার চেস্টা করেছেন, তাঁর অতীন্দ্রিয় ঝোঁক সত্ত্বেও। উদাহরণত, তিনি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠেছেন "এই নবট্রাইবল অর্থব্যবস্থা"য়। অবশ্য তিনি তিনটি কথার একটিরও সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নি।

তাই, তিনি যখন তাঁর প্রতিপাদ্যের মর্মে অর্থাৎ হিন্দু সমাজে জাতিভেদ সমস্যায় পৌঁছান, তখন তিনি বলেন বটে যে শূদ্ররা ছিল ট্রাইবল বা গোষ্টিকে গোষ্ঠী হিসাবে হিলটস্ যা আদিম সমষ্টিগত কিন্তু বহুজনীন সমাজের মধ্যে দাসপদবাচ্য। কিন্তু তাঁর নিজেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা স্পষ্ট, তাও তাঁর এশিয়াটিজ্ম বা এশিয়াবাদের ধোঁয়ায় হারিয়ে যায়। তাঁর মতে ধর্মের শৃঙ্খল অর্থনৈতিক দাসত্বের চেয়ে শোভন। তাঁর স্বদেশপ্রেম নিশ্চয়ই ভালো জিনিষ, কিন্তু তিনি ভুলে যান ধর্মের ব্যবস্থা এ ব্যাপারে তখন থাকতে বাধ্য ছিল, কারণ সে সমাজ ছিল তাঁরই মতানুসারে যথাক্রমে ট্রাইবল, প্রিমিটিভ, কম্যুনল, প্যাস্টরল এবং কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার স্তরে। সে স্তরে কর্তারা বণিকপ্রভু হয়ে ওঠে না, হয়ে আসে ব্রাহ্মণ, কর্মীরা দাস না হয়ে হয় শূদ্র।

অসতর্ক কিন্তু এক সৎ মুহূর্তে কোশাম্বী বলে ফেলেছেন যে রোমক প্রভুদের মতোই আর্যরাও শূদ্রদের অর্থাৎ বিজিত অনার্যদের নিয়োগ করতেন—বাস্তব ঐশ্বর্য ও আয়ের জন্য। তিনি এও বলেছেন যে শূদ্ররাই শ্রমের প্রধান উৎস, তারা আধাস্বাধীন এবং সম্পত্তির অধিকারহীন। আমরা এও জানি যে ব্যক্তিক অর্থাৎ ছোটোখাটো

স্থানীয় ব্যবসায়ীর রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে কোনো হাত ছিল না। এ সমস্তই, কোশাম্বী বলেন ধর্মের ব্যাপার। এ যে আদিম-সমষ্টিগত আর্যসমাজের দাস্যভাব নয় কিন্তু আদিম অথচ অশ্বে লৌহে শক্তিশালী, পরোক্ষচিন্তায় কথঞ্চিৎ পারদর্শী উদ্বাস্তুস্বভাব এক সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জয়পরাজয় ঘটিত বিরোধের জন্যই ঘটেছিল সে কথাটা তিনি উড়িয়ে দিতে চান। অথচ তিনিই অন্যত্র বলেছেন যে আর্যের এই বিশেষ ধর্মও উৎপাদনের নিম্নস্তরের ফল, বাস্তবকে এড়ানোর ফল। আরেক পৃষ্ঠায় তিনি "সস্তা দাসশ্রম" এ কথাও বলেছেন।

আর্যামি বা হিন্দু ধর্মে কোশাম্বী গড় বেঁধেছেন, এই আর্যামিতে নাকি শাসকের বলপ্রয়োগ থাকে না, আর থাকে না তার শাসিতের প্রতিবাদ এবং বারবার দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াস।

আর্যপর্বের পরে ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দেশ না দিয়েই কোশাম্বী একেবারে চলে আসেন বুদ্ধের কালের গণরাষ্ট্রগুলিতে এবং তাদের নাম দেন "অব্রাহ্মণীকৃত আর্যগোষ্ঠীগণ।" কিন্তু কেন যে পাহাড়ীরা অব্রাহ্মণীকৃত, কেন বা কেমন করে বা কার দ্বারা বাকি আর্যরা ব্রাহ্মণী-কৃত সে বিষয়ে তিনি মৌন।

অধ্যাপক কোশাম্বীর সহস্রবর্ষব্যাপী এক একটা লম্ফে ত্রিকালের মাথা ঘোরা স্বাভাবিক। এমন কি তাঁর হাতে ভূগোলও হয়ে যায় সার্কাসের খেল্। তিনি বলেন, রাজগির নেপালের মতোই নাকি হিমালয় পদগিরিতে অবস্থিত, আবার তিন পৃষ্ঠা বাদে রাজগিরকে চালান করে দেন সিংভূম ধলভূমে। এবং ভূগোলের এই ভিত্তিতে কিছু বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ক'রে বসেন।

তারপরে আমরা এসে পড়ি "সম্পূর্ণ বিকশিত ফিউডালিজ্‌মে"— যা সেকালের নিতান্তই শুদ্ধ ফিউডালিজ্‌ম থেকে ভিন্ন। এই "পূর্ণ ফিউডালিজ্‌ম" হল পিকিউলিআরলি এশিয়াটিক মোড্ অব্ প্রোডাকশন অর্থাৎ উৎপাদনের একান্তই এশিয়াটিক বা ধার্মিক প্রণালীর ফলে।

এ রকম একটা জেটবিমানে ভারত পরিক্রমার পরে যে কোশাম্বী স্তালিনের উপরে মেগালোমেনিয়াক আক্রমণ করবেন, সেটা বোধহয় স্বাভাবিক। অধ্যাপকের মনে হল স্তালিন নাকি এন্টি-এশিয়াটিক। কারণ স্তালিন মার্কসীয় ভাষায় এশিয়াটিক ও প্রাচীন উৎপাদনজনিত সম্বন্ধের পুনর্ব্যাখ্যায় বলেছেন উৎপাদনের আদিম গোষ্ঠীগত সমাজ ও দাসত্বের সম্বন্ধের কথা। তাতে নাকি ধর্মের মাহাত্ম্য হানি হয়। অথচ গত একশ বছরে ইতিহাস ও নৃতত্বের জ্ঞানের বিস্তারে বোঝা যাচ্ছে যে এশিয়াটিক নামে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক সংজ্ঞা নিষ্প্রয়োজন। এশিয়ায় দেখা যায় একদিকে আদিম গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রার জের এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্যপক্ষে দাসস্তরের সমাজ ব্যবস্থা। এই স্তরে ভারতের আর্য অনার্যের বহু জাতিগত কারণেই শূদ্রত্বের জাতিভেদ আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল। ধর্মের বর্ণবিন্যাস এরই ভিত্তিতে।

কোশাম্বী বাল্মীকিকে এবার ধূলিসাৎ করবেন—কারণ বাল্মীকি সাতকাণ্ড রামায়ণে নাকি একবারও বলেন নি সীতা কার পিসি।

সুরুচি ও পাণ্ডিতম্মন্যতা

এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় কোনো কবিই ইংরেজি গন্থ বা পন্থকাব্যে সুরাওআর্দির সমকক্ষ নন, তা সে শ্রীমতী নাইডু বা ইক্‌বাল, দত্তপরিবার বা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ বা কাশীপ্রসাদ যাকেই ধরুন। এক শুধু মনমোহন ঘোষই সুরাওআর্দির কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয় এবং তার কারণ ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগের বেশি ঘনিষ্ঠতা ততটা নয়, যতটা হয়তো মনমোহনের কবিত্ব বা সাত্ত্বিকতর কবিস্বভাব।

বিদেশীর কাছেও স্পষ্ট যে সুরাওআর্দি ইংরেজির মর্মে প্রবেশ করেছেন। রোমান্টিকতা বা ভাবালুতায় ইংরেজিতে বিদেশী তথা স্বদেশীর পক্ষে একটা সহজ আপাতসুবিধা আছে, যেটা রসিক কাব্যে নেই। এবং সুরাওআর্দির কীর্তিই তাঁর বিদগ্ধ লঘু নাগরিক কবিতাগুলি। সুরাওআর্দির সমাজ-ভ্রমর নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য ও ইংরেজিতে তাঁর অন্তঃশীল মমতায় তাই সোনায় সোহাগা হয়েছে। বিদেশীর পক্ষে এ কৃতিত্ব বিস্ময়ের ও প্রণম্য। অবশ্য বিদেশীসুলভ কথার নেশায় এখনো তাঁর মধ্যে মধ্যে শিথিলসমাধি ঘটে, ফলে কবিতা হয়ে পড়ে গৌণ, মুখরোচক শব্দটাই হয়ে ওঠে মুখ্য। ইএটসের ভাষায়, তার ফর্ম বা প্রজ্ঞামাত্রিক ভাবনা নেই, তাঁর প্রেরণা গদ্যের আভিধানিক শব্দ-স্বাতন্ত্র্যে কাব্যের অখণ্ড কেলাসিত রূপ তাঁর আয়ত্তে নেই। তাই obstreperous বা lone কথা দুটি তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর কথাপ্রয়োগ প্রায় হয়ে ওঠে স্থানকালপাত্র বোধহীন, তাতে আর আকস্মিক বিস্ময়ানন্দও থাকে না। তাই চীনসাগর থেকে তাঁর কবিতায় ritornels দেখেও বিচলিত হই না, যদিচ কথাটি গতিয়ের ভিনিসীয় কবিতায় সার্থক।

Essays in Verse—by Shahid Suhrawardy, (University Press, Cambridge).
Prefaces—by Shahid Suhrawardy, (University Press, Calcutta) 1938.

এই গদ্যস্বভাবের আরেকটি দিক দেখি তাঁর কাব্যে মহাজনের প্রতিধ্বনির বিশেষত্বে। প্রথম কবিতায়ই ব্রিজেস্‌-মার্গে তাঁকে দেখি এবং যেহেতু ব্রিজেসের কাব্যে আবেগ ও শব্দস্রোতের উচ্চাবচ নেই, তাই সুরাওআর্দিও এখানে প্রায় অখণ্ডতা অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত, কীট্‌স্‌ ও ইএট্‌সের অনুরূপ তাঁর সমাসযোজনা যথেষ্ট রসঘন হয় নি, এমন কি বাধ্যতামূলক বলেই মনে হয়। যেমন মনে হয় The Asoka Tree নামক উপাদেয় মুক্তছন্দ কবিতাতে in the days of yore। কিন্তু পরের কবিতাটি জয়সের সঙ্গে তুলনা করলে সুরাওআর্দিকেই অভিনন্দিত করতে হবে। অথবা তার পরবর্তী কবিতাটির Beside the primrose landslides of the South অডেনের হাতে মানায় কিন্তু But abating my sense?

এখানে বলা দরকার যে সুরাওআর্দি মহাকবিদের রচনা পাঠ করেছেন বটে, যেমন প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই করা উচিত; কিন্তু কাব্য তাঁর পেশা নয়। তাঁর বিদগ্ধ মনে তাই অনুকরণই হয়, তাঁর রচনা অনুকরণ হয় না। এটা মনে রাখলে When you Unloose your Hair, Foam of the Sea, I Sat, Lines for an Album, You Will not Miss Me (মনরো বা হুমবর্ট উল্‌ফ?) An Old Man's Songs—I (সাইমন্‌স্‌?) নামে কবিতাগুলিতে আর ইএট্‌সের সন্ধানে ঘুরতে হয় না অথবা Moon in the Sky এচ্‌-ডি-কে বা Cotswolds-এ ব্লণ্ট মেরেডিথ ও টেনিসনকে; My Thoughts Flock to Thee-তে মেনেল্‌কে; In Russia-তে ভের্‌লেন্‌কে; In the Earth-এ টম্প্‌সন্‌ বা এ-ই-কে অন্বেষণ করতে হয় না। বরঞ্চ তারিফ্‌ করতে হয় তাঁর কুম্ভীরস্মৃতির নৈপুণ্য এই উদ্ধৃতিতে:

Ruth singing waist-high midst my lands,
Reaping with splendid hands
The lean harvest of my hazardous plight!

যদিচ A Fragment কবিতাটি শিথিল ও কীট্‌সীয় উক্তির পরে O Shulamite, my Shulamite ইত্যাদিতে মন বিক্ষিপ্ত হয়।

তাঁর শাস্ত্রমানানুগ কবিতাগুলিতে আপত্তি উঠতে পারে যে, গাঢ়বন্ধ বহিরঙ্গরূপে পদ্যসুলভ সংহতিতে তিনি সংযমের প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সেই কারণেই ফাঁকিও দিয়েছেন। কিম্বা Narcisse Mallarmeen-তে তিনি মোটেই মালার্মেপন্থী নন, একথাও উঠতে পারে। অবশ্য সুরাওআর্দির প্রকৃতি ও প্রস্তুতিতে সেটা সম্ভবও নয়, Prefaces-এর শেষ প্রবন্ধে মালার্মে বা ভালেরি সম্বন্ধে সমাচারেই তা বোঝা যায়। মালার্মের নাম না ক'রে সিমণ্ডস্, ডগ্‌লস্ বা ওশনেসির নামই হয়তো তাঁর করা উচিত ছিল। এলিঅটের মতো তিনিও গতিয়ের ভাস্কর্য-কঠিন চতুষ্পদী ব্যবহার করেছেন এবং যেখানে এলোপাথাড়ি নানাবিধ জহরতের নাম করেছেন, সেখানে হয়তো আমাদের গতিয়েকে— বা প্রাচীন মার্ভ্‌ল-কে পড়বে না, পড়বে ঐ সিমণ্ডস্‌কেই, ইএলোবুক্ ও রাইমর্স্ ক্লবের কবিকিশোরদেরই। এবং সেটা নিন্দার্হ নয়। সুরাওআর্দি মানুষ নাইন্‌টিইস্‌মেই। তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও তা বোধগম্য। তাঁর Prefaces-ও এই কথার সাক্ষ্য এমন কি তাঁর গদ্য বাক্যরচনাতেও, পেটারে ও সংবাদপত্রের সংমিশ্রণে।

কিন্তু To My Dog, Letter from O' ni ইত্যাদি কবিতা সকলেরই ভালো লাগবে—বিশেষ যদি ক্যাভালিঅরভঙ্গীটি তাঁদের ধাতে সয়। কারণ শাহেদ্ সুরাওআর্দি ইরানী-ইংরেজী শেষ ক্যাভালিঅর্। দ্বিতীয় চার্লস্ আজ মৃত, সপ্তমের নাতি অষ্টম এডোআর্ড আজ বনবাসে, যাযাবর ইরানীরা আজ অনেকেই ইউ-এস্-এস্-আরে প্রগতিশীল—তাই সুরাওআর্দির At Tennis-এ মনে হয়—

Friend, the world smashes in my brain—
Girders and plinths, limbs and stars !
In the sudden upheaval of unbidden centuries
The lands convulse with cataclysmal speed.
Flaming wide nostrilled monsters plunge
Across the convex of the skies,
I stretch torn hands to reach your piteous hands ;
I seek through tattered space your ample eyes.

But you,
Stranger to apocalyptic needs,
In the narrow orb of your accurate mind
Rotate from hour to hour :
Dinner for two ;
Tennis at four ;
Odol and powder before going out to friends ;
Cautious caresses ;
Honourable amends ;
Lips painted to the crimson of a wound
After sentimental flutters ;—
Whatever happens one should go to sleep
Carefully drawing to the shutters……
Oh ! Passion lionhearted, that ruled calamitous wilds,
Browses on well-laid lawns, a weary sheep.

শেষ দুই লাইন প্যারডি মনে হলেও, আমাদের অনুকম্পা উচ্ছল হয়ে ওঠে কবির জন্যে এবং অপ্রত্যাশিত দাবিতে কাতর নায়িকার জন্যেও, যাঁর মধ্যে লা পাসিওনেরা-কে খোঁজাটা অবিচার অথচ অবস্থাবিশেষে হয়তো স্বাভাবিক !

সুরাওআর্দির এই কবিস্বভাবের বিদগ্ধ নাগরিক বৈশিষ্ট্য মনে রেখে তাঁর অধ্যাপকোচিত প্রথম আত্মপ্রকাশ Prefaces বা মুখবন্ধমালা পড়লে পাঠকেরই সুবিধা। কারণ যস্মিন্ দেশে যদাচার এবং সুরাওআর্দি যে সভ্যজগতে বাস করেন, সে বিদগ্ধ তত্ত্ববিশ্বে পাণ্ডিত্য কারো পেশা হতে পারে না, সেখানে শিল্পীর ফরমায়েস্ থাকলেও সেখানে কেউ শিল্পী নয়, আর পুরাতত্ত্বে বা ইতিহাসে বা নৃতত্ত্বে তথা শিল্পানুরাগে আত্মহারা হওয়া সে জগতে বর্বরতারই নামান্তর। প্লেটোর নাম করলেও তাঁর জপমন্ত্র সৌন্দর্য, সক্রেটিসের টোকালন নয়। তাই প্লেটোর ভ্রান্তপাঠে সুরাওআর্দির মনে হয় আর্ট ও সুন্দর সমপদ বাচ্য, যেমন ব্যবহারিকার্থ ও পুরুষার্থ নিয়ে পাত্রাধারতৈলমূলক বাক্যজাল বিস্তারের পরে তিনি প্রস্তর যুগের শিল্পীর ম্যাজিকাল বা অথর্ববৈদিক আর্ট বিষয়ে যা বলেন,

তা বর্কিট বা চাইল্ড্, বল্ড্উইনব্রাউন্, বা ব্রোইল্ কারো মাথাতেই আসে নি।

এ সব অনুরূপ তথ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ On the Study of Indian Art-এ পাঠক পাবেন। বহুকাল আগে রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষের এই বিষয়ে একটি ছাত্রবোধ্য প্রবন্ধ পড়েছিলুম, সেটি লেখার পর ত্রিশ বছর কেটেছে, অনেক জ্ঞান বেড়েছে, তবু সুরাওআর্দি সে লেখাটি সবিনয়ে পড়লে তাঁর ভ্রান্তিবিলাস হয়তো কম্‌তো। কিন্তু তাঁর প্রাগৈতিহাসিক গবেষণা তাঁর মনোলৌল্যই, যার দুঃসাহস এবং নিশ্চিন্ততা চাইল্ড্, পীক্ বা ফ্লুরের ঈর্ষা জাগাবে। অবশ্য প্রবন্ধটিতে তিনি নিজের কীর্তিঘোষণার সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে অনেকেরই নামোল্লেখ করেছেন। তবে সে নাম, শুধু নাম, বিনয়ী পাঠককে ধাঁধানো ও ভয় দেখানো মাত্র। এবং এস্‌কিমো ছাড়া ইওরোপের সর্বদেশের সেই সব পণ্ডিতদের অন্তত অনেকেই, যথা সারে বা ডল্টন্ যে সুরাওআর্দির অনুশীলন ও সিদ্ধান্তের জন্যে তাঁদের দায়ী করলে মাম্‌লা আন্‌বেন, সে কথাটা ঘুণাক্ষরে জানান্ নি। শেষে শুধু স্তম্ভিত পাঠকদের তিনি জানিয়েছেন যে, যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি শিল্প কারুকলা বা টেক্‌নীক্ বিচার এবং সমাজতত্ত্বের মিলিত সাহায্যে শিল্পালোচনার পক্ষে। আমরাও তাই। ফলে উদ্‌গ্রীব হয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধের লোকশিক্ষা ও শিল্প বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাধুকথার চর্বিতচর্বণ সাঙ্গ করে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ইন্দো-পারসীক চিত্রে এসে স্বদেশে স্বভূমিতেও বেঘোরে ঘুরি।

অথচ শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা প্রাথমিক সেই চোখ মন, সেই শিল্প-সংবেদন ও স্বাভাবিক সৎরুচি সুরাওআর্দির প্রধান গুণ এবং যেহেতু ঐ গুণ ভারতীয় শিল্পালোচনায় একান্ত দুর্লভ, তাই সুরাওআর্দিকে সাদর শ্রদ্ধায় স্বাগত বলতে হয় ভারতীয় শিল্পবিদ্যার প্রাদেশিকতা অধ্যাত্মবিলাস রুচিহীনতা ও সংবেদনহীনতার মরুভূমির মধ্যে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে স্বকীয় রুচিবোধ ও সংবেদন খাতির পায় না, খাতির পায় এক-রকম চর্বিতচর্বণ পণ্ডিতম্মন্যতা এবং সুরাওআর্দির মতো রসজ্ঞ ব্যক্তিকেও

বাধ্য হয়ে এই পণ্ডশ্রমে নামতে হয়েছে; নিজের প্রকৃত শিল্পবেদনা ও স্বকীয় প্রজ্ঞার প্রতি একরকম দায়িত্বের অপলাপ, স্যুরাওআর্দির মতো শিল্পসাহিত্যের কমলবনবাসীকেও যে দেশের মত্তহস্তীদের মধ্যে নিজেকে হারাতে হয়েছে সেটা আমাদেরই একটা ট্রাজেডি।

উপভোগ্য তাঁর দায়িত্বহীনতা বটে, কিন্তু হায়, সমাজতত্ত্বের বিস্তর প্রস্তুতি, শিল্পজ্ঞানের সাধনা এবং মনোধর্ম বিচারের সতর্ক সংবেদ্যতা যেখানে নেই, সেখানে উদ্ধত অগ্রজদ্রোহিতায় অন্তত পাঠকের কোনো পদবৃদ্ধি হয় না। কারণ পাণ্ডিত্যপ্রমাণের স্বকীয়তায় তন্ময় স্যুরাওআর্দি ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান সবই ভুলে গেছেন গোপাল ভাঁড়ের সেই বিপ্রপণ্ডিত উৎকলবাসীর মতো। তাই পারস্য তাঁর কাছে একচ্ছত্র রাজবংশের একটানা ইতিহাসের পেয়ালায় ঘনীভূত। তাই তাঁর মহাব্যসন উদ্ভট ইরাণতত্ত্বে বলে যে উক্ত ইরানীরা পারস্যের অনাদ্যন্ত মধ্যপদলোপী রাজা অর্থাৎ এলামীরা ছাড়াও সেলুকীয়, পার্থীয়, দামাস্কী, খলিফা, বোগদাদী খলিফা, গজনীক, সেলজুক তুর্কী, মোঙ্গল, তৈমুরী ইত্যাদি বহু বিদেশী বংশ বাদ দিয়ে তাঁর পারস্যের ইতিহাস শুধু একিমেনী, সাসানী ও সফবীতেই নিবদ্ধ। কিন্তু তিনি মার্কস্‌বিরোধী হলেও ইতিহাস তাঁর মুখোপেক্ষী নয়। আর আমাদেরও হবার হেতু নেই। একাধিক চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানম্র মনীষী স্যুরাওআর্দির চেয়ে দীর্ঘতর জীবন কাটিয়াছেন এই নানা উৎসের মধ্যে পারস্যের শিল্প-ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে। তাই স্যার টমস্ আর্নল্ড যেখানে পদক্ষেপে দ্বিধান্বিত, সেই অজ্ঞানশান্তিতে স্যুরাওআর্দি ধাবমান হলেও আমরা হব না। তাই সারের সঙ্গে আমরা পারস্য শিল্পের জন্ম খুঁজব অসীরিয়ায়, গ্রোমানের সঙ্গে ঘুরব মিশরে। এবং পারস্যে স্যুমেরীয় প্রভাব এবং গ্রীক, রোমান ও পরে বাইজাণ্টীয় এবং আরবীদের প্রায় ক্রোক্ করবার মতো ঋণ আমরা হিসাব করতে যাব, স্যুরাওআর্দির রসিক সঙ্গ অগত্যা ছেড়েই। চীনের কুটুম্বসৎকারও আমাদের গোচরে আসে পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ এবং সাকিসিঁয়া, মার্টিন বা ব্রশের

সাহায্যে। তদুপরি সহজবোধ্য বিনয়ী বিনিঅন্ বা ব্যাঙ্গল্ গ্রে তো আছেনই।

তাই কুমারস্বামী, হ্যাভেল, ব্রাউন প্রভৃতিকে সুরাওআর্দির ভোজ-পুরীতে ভূমিসাৎ দেখেও অস্থির হইনা, যখন দেখি যে মুঘল ও রাজপুত চিত্র পারসীক হল এই তিন কারণেঃ প্রথমত, মুঘল, রাজপুত ও পারসীকদের ইতিহাসেতর পূর্ব-পুরুষ হল ইরাণীরা; দ্বিতীয়ত, পারসীক তথা রাজপুত চিত্রের বর্ণাঢ্যতা; তৃতীয়ত, কোনো কোনো পাহাড়ী চিত্রের পটভূমিতে স্থাপত্য নিদর্শন নাকি পারস্য-সুলভ এবং হিমালয়-প্রাপ্য তনুপর্ণ গাছের আলঙ্কারিক প্রয়োগ নাকি মূর্খ উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিকদের মত সত্ত্বেও পারসীক সাইপ্রেস্ বৃক্ষজ।

তাই আগ্নেয়গিরির এই মূষিকপ্রসবে আমাদের আর কোনো বিস্ময়ের কারণ নেই। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছি লেখক পারসীক জাতীয় মহাকাব্য পড়েন নি দেখে, সে তো ইতিহাস নয়! পড়লে তিনি জানতেন যে তাঁর একচেটে যাযাবর ইরাণীরা সেখানে ইরাণী নয়, তুরাণী; এবং ইরাণ তুরাণে যুদ্ধ চলে। অধিকন্তু মিজেঁা প্রমুখ বিশেষজ্ঞের মারফৎ পারস্যের ভিতরে কি রকম অনিরাণী মধ্যএসিআর মোঙ্গল প্রভাব গিয়েছিল, তাও সহজে জানা যায়। স্টাইন, পেলিও, মুন্স্টেরবের্গ, গ্রুন্‌বেডেলের সমর্থিত একটি তথ্যও লেখক চেপে গিয়েছেন, অজ্ঞাতসারে হয়তো, কারণ তাতে তাঁর ইরাণী কীর্তনের হানি হয় না। বরঞ্চ মধ্য-এসিআয় যে ভারতীয় ধর্মশিল্পের উপনিবেশ ও পরে স্বকীয় বিকাশ, যার পারমাত্রিক শাখা গেল চীনে এবং সাংসারিক প্রেরণা গেল পারস্যে,—সেই যোগসূত্র ধরে সুরাওআর্দির ভারতীয় ও পারসীক শিল্পের আরেকটা রাখী বন্ধন করতে পারতেন। যেমন পারতেন বৈদিক পুরুষে বা ইহুদি আদিপিতা অ্যাডামের কথা তুললে।

পাঠক বলতে পারেন, রাজপুতচিত্র কি ভিন্ন প্রকৃতির? যেহেতু রাজপুত চিত্র হচ্ছে মূলত ফ্রেস্কো বা টেম্পেরাচিত্র আর পারসীক চিত্র মিনিএট্যর বা আলঙ্কারিক এবং ইলস্ট্রেশন বা চিত্রোপাখ্যান। এ

দু'এর জাত আলাদা, ধর্ম আলাদা। বাঘ জোগিমারা অজন্তার ঐতিহ্যে রাজপুত চিত্র, তা সে অভিজাত বা লৌকিক, রাজস্থানী বা পাহাড়ীই হোক্, প্রাণ পেয়েছে, যার প্রমাণ বহু বিরাট চিত্রে ও চিত্রের খস্ড়ায় এবং তার অবশেষ এখনো জয়পুর প্রাসাদে দ্রষ্টব্য। তারপরে রঙের বিশেষত্ব, রঙের প্রয়োগ, পটভূমিতে হিমালয় বা রাজপুতানার নিসর্গদৃশ্য; ভারতীয় প্রতীক ব্যবহার যথা জলের প্রতীক চক্রাবর্ত, ত্রিকোণোপস্থ হ্রদসরোবর, পদ্মাদিফুল, বক সারসাদি পাখি, ভারতীয় গাছ গাছড়া তো আছেই। সর্বোপরি রাজপুতের এবং তদ্‌গৃহীত পরিণত মুঘল চিত্রে পারস্যজাত বর্তনা বা সার্ফেস মডেলিং বাই শেডিং আকাশ বা স্পেস ও পরিমণ্ডল বা অ্যাটমসফিঅর এর আভাস। এই গোত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ এখনো সাক্ষাৎ না জানা গেলেও এর ভারতীয় ধারাবাহিকতা অনুমেয়, বিশেষ ক'রে সমাজচৈতন্যব্যাপী ব্যক্তি-অতিরিক্ত শিল্পধর্মের কথা মনে রাখলে। বিষ্ণুপুর বা মেদিনীপুরের পট ও পাটায় এই ঐতিহ্যেরই বঙ্গীয় বিকাশ, নেপালী চিত্রেও এর অনুরূপ সাক্ষ্য। জৈনচিত্রকে নিন্দা ক'রে, রাজপুতচিত্রের ঠিকুজি কষতে পারস্যে যাওয়া সুরাওআর্দির খেয়াল মাত্র —চীনে গেলেও বরং বুঝতুম, কারণ কাগজ, তুলি ও রঙের আমদানী হয়তো একদা চীন থেকেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি কুমারস্বামীকে সংশোধন করে বলেছেন, বাজারের কথা "তিব্বতী" থেকেই নাকি পারসীক প্রভাব স্পষ্ট। আমাদের কাছে নয়, তিব্বত পারসীক বা ইরাণী নয় ব'লেই, চৈনিকাত্মীয় ব'লেই আমরা জানি। আর রাজপুত-চিত্রের স্ট্রেন্‌গেন্ আন্টিকেন্ লিনিএনফ্যুরুং বিষয়েও তিনি অন্ধ, যদিচ এই বলিষ্ঠ প্রাক্‌সভ্যসুলভ লৌহতন্ত্রবৎ কঠিন বাহুলেখার তুলনা খুঁজতে যেতে হয় মিশরে, অসীরিয়ায়, মাইকেনিতে, আদিমগ্রীসে।

কিন্তু তাঁর মনই বিপরীতধর্মী, তাই তিনি মুঘলচিত্রের দেশী পরিণতিতেও শুধু পারসীক মার্গ দেখেন, শিল্পীর দৃষ্টিতে যা দেখা অসম্ভব। আর তিনি মুঘলচিত্রে শুধু পারসীক গজল; দ্বিপদী বা

সোরাব-রুস্তম ও বহরামগোর্ আজাদকেই দেখেন [লয়লামজনুকে দেখেন না], যদিচ সামান্যশ্রমেই তিনি জানতে পারতেন যে আকবরের রাজত্বেই রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ, নলদময়ন্তীর কথা, অথর্ববেদ হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ চল্তি হয়েছিল। গোআলিঅর-প্রাসাদে রজম নামা নামক মহাভারতের আকবরী সচিত্র অনুবাদ এখনো রক্ষিত। এমন কি, বিজাদের কালে সুফীদের প্রতাপ বিষয়েও স্বরাও-আর্দি অচেতন। তাই তিনি পূর্বাচার্যদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে পারসীকে চিত্রের নাটকীয় বা বর্ণনাত্মক গুণ তাঁদের চোখের দোষ, যদিচ তিনি কোনোমতেই চক্ষুবিশারদ নন্ বলে তাঁর চেয়ে আর্ণল্ড বা বিনিঅনের উপরেই আমাদের আস্থা। এবং এ প্রসঙ্গে অন্য প্রবন্ধেও তিনি ইস্তাহার দিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পই উপাখ্যানাত্মক ও নাটকীয়। কারণ ভারতীয় শিল্প ধর্মতাত্ত্বিক ও শিল্পশাস্ত্রানুগ। কিন্তু বিড়াল কখনো কখনো থলি থেকে বেরোয় এবং বিজাদ-কে স্বরাওআর্দি বলে ফেলেন প্রাচ্যের রাফাএল। তিনি যে বতিচেল্লির নাম করেন নি, সেটা তাঁকেই সাজে। সুধী পাঠককে এই তুলনায় রাফাএল বিষয়ে অদ্ভুত ভ্রান্তির বিশদ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, শুধু রাফাএলের বহুধাপ্রতিভার এক-দিক স্মর্তব্য—যে রাফাএল উপাখ্যানচিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এই চিরসবুজ অবুঝ রোমান্টিক মনোবৃত্তি ও তজ্জনিত বিশ্বের শিল্প ধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধ্যানাভাবে যামিনী রায়ের উপর প্রবন্ধ বা A Nations Art-ও তাই গোড়ায় গলদে টলমল। লোকশিল্প সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তিনি আর গান্ধীজিদের ধমক দিয়ে ইতিহাস-বিমুখ হয়ে লোকশিল্পের শান্তিনিকেতনী চালে প্রাণহীন উজ্জীবন কাম্য ভাবতেন না। জাতির সমষ্টিগত চিন্তাধারা ও শিল্পৈতিহ্যের বংশ-পরম্পরায় যে লোকশিল্পের জীবন ও জীবিকা, এ আর্যসত্য নৃতত্ত্ব মনো-বিজ্ঞান না পড়েও স্থূল শুভবুদ্ধিতেই বোঝা উচিত। কিন্তু সমাজোৎ-সারিত এই সহজবৃত্তি ভু'লে লেখক গেয়েছেন যে, লোকশিল্প মহান, লোকোত্তর এবং সেইখানেই বিদেশী শিল্পের নিছক শিল্পগত চালের

বিশেষ প্রভাব অন্বেষ্য। আধুনিক ব্যক্তিস্বতন্ত্রো সভ্য শিল্পী, যথা পিকাসোর কথা তিনি ভেবেছেন বা হয়তো পড়েছেন যে পল ক্লে কি রকম তাঁর ছবির পূর্বজ খুঁজেছেন কপ্টিক বস্ত্রে, বাইজাণ্ট'ায় প্রস্তর খচিত কুট্টিমে, গথিক ভাস্কর্যে, ঈস্টার দ্বীপের প্রতিমায়, আলোস্কাএস্কিমোর মুখোসে, অস্ট্রেলীয় কালো মানুষের বল্কলচিত্রে, প্রাচীন কাঠখোদাই-এ, প্রাক্‌জর্মান শিল্পে, এবং এল গ্রেকো, সেজান, রুসো, পিকাসো, গোইআ, ব্লেক্, মাতিস্ বা বিআর্ডস্‌লি-র ছবিতে।

ফলে কালিঘাটের পুতুল হয়ে পড়েছে মিশরাগত। সুরাওআর্দি বলেন তার হেতুও স্পষ্ট ঃ বাংলাদেশ সমুদ্রতীরে অর্থাৎ মিশর বাংলায় পি-এণ্ড-ও জাহাজের যাতায়াত তো খুবই বেশি। ব্রতচারী নাচে ক্ষণে-ক্ষণে যে মিশরী পার্শ্বচিত্র ফোটে, সেটা তিনি কিন্তু লক্ষ্য করেন নি। উড়িষ্যার কুটীর চিত্রণও কি মিশরী চিত্রের কথা মনে আনেনা? বাংলা মেয়েলি ব্রতে যে বৈদিক সামের এবং মিশরী মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সে বিষয়েই বা সুরওআর্দি মৌন কেন? আর বাংলা আল্‌পনার সংকেতিতালঙ্কার প্রতীক কি জার্ম্মানি-তে বা স্কটল্যাণ্ডে, আমেরিকায় বা বা চীনে, রাশ্যায়, বা পূর্বএসিআয় তিনি দেখেন নি? এদেশী মাটির পুতুলের সঙ্গে কাণ্ডিয়ায় পালাইকাস্ত্রোপ্রাপ্ত নৃত্যপ্রতিমার সঙ্গে কি মিল নেই? যামিনী বাবুর একটি ছবির মুখ ও ভারতীয় মধ্যযুগান্তিক অহল্যাবাই জাতীয় দেব-মূর্তির সঙ্গে বের্লিনস্থ কপটিক ব্রন্‌জ ধূপাচির সাদৃশ্য বা গিনি প্রদেশস্থ মুখোস বা বেনিনের ব্রন্‌জ মুখের সমতুল্য ভারতীয় মূর্তি বা মুখ কি তিনি দেখেন নি? ভারতীয় শিল্পের ভঙ্গ দেখে কি তাঁর মনে হয়নি যে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র বা প্রতিমাশাস্ত্র গ্রীক-প্রভাবে মানুষ কারণ এফেসাসী হর্মিস দণ্ডায়মান আমাদেরই পরিচিত ভঙ্গে? তবে তিনি বলেছেন যে,—রাজপুতনায় বাহু-লেখময় খসড়া চলতি থাকলেও, বা অজন্তায় খসড়াচিহ্ন দৃশ্য হলেও, প্রতিবাহিত প্রযোজনা পারসীক আমদানি। অতঃপর তিনি বলেছেন কন্দাকৃতি পল্লব প্রায় সব দেশের লোকশিল্পে, যথা বাংলা পটে রাশ্যান্ লুবকে সুলভ, রাজপুত-

চিত্রের ঐরকম গাছ না কি ইরাণী। এখানে পাছে পাঠক ভাবেন যে সুরাওআর্দি নিজেকে পারসীক মনে করেন, তাই জানানো ভাল যে ডি, এচ্ লরেন্সের পত্রাবলীতে প্রকাশ, সুরাওআর্দি আরবী সৈয়দ!

কিন্তু সত্যই তাঁর আত্মবিসম্বাদী কথার কোনো ব্যাখ্যা নেই। পারম্পর্যহীন ও একেবারে বিপরীত এলোমেলো কথায় তাঁর অসতর্ক লেখা এত কণ্টকাকীর্ণ যে তার উদাহরণে অবলীলায় পাঁচ পাতা না ভরিয়ে একবার যামিনী রায়ের উপর প্রশংসামূলক উপাদেয় প্রবন্ধটিই চকিতে দেখা যাক্। তার মধ্যে তিনি যে ভর্টিকাল বা ঊর্ধ্বমুখ ও হরাইজণ্টাল বা অনুপ্রস্থ রেখা নিয়ে বা ধর্মতান্ত্রিক ও ধ্রুপদী এবং দেশী রীতি নিয়ে শিল্পজ্ঞম্মন্য কায়দা অকারণে দেখিয়েছেন সে বিষয়ে না হয় বোরিঙ্গর বা ব্যোল্‌ফ্লিনের কথা ভেবে ধৈর্যধারণ করা যাক্। কিন্তু যামিনী রায়কে যে তিনি নিজের রোমান্টিক কল্পনায় বাক্‌শক্তিহীন অবুদ্ধিবাদী বলেছেন তার মধ্যে সত্য কোথায়? যামিনাবাবুকে আমার চেনার সৌভাগ্য আছে। তিনি নিজের ও আনুষঙ্গিক শিল্প সম্বন্ধে জটিল ও গভীর আলোচনা করে আনন্দ পান এবং আমাদের শিক্ষাদান ক'রে থাকেন। তিনি কোনোমতেই অন্ধ তাড়নায় তাঁর চিত্রের আনন্দচিন্ময় রেখাশুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করেননি। এবং তাঁর বাউলচিত্রের মধ্যে কোনো বিকলাঙ্গ নেশাখোরের ঘোর নেই, তাঁর বাউল আপন ভূতমাত্রিক রূপেই চিত্রের শিল্পগত প্রজ্ঞামাত্রায় বিরাজমান, বাউল যিনি দেখেননি, তাঁর কাছে তা মনে না হলেও। তেমনি অন্তঃসারহীন ও ভিত্তিহীন যামিনী বাবুর ছবিকে প্রাকৃত বা বর্ণনাত্মক বলা। আর ঐ হরতনমার্কা বক্ষ সম্বন্ধে গবেষণারই সার্থকতা কি?

সুরাওআর্দির পক্ষে তো এসব কথা বলা খেলামাত্র। কারণ তাঁর মনের ঝোঁকই এই দিকে! সেইজন্যই তো তাঁর মুঘল প্রতিচিত্র এত ভালো লাগে, তাই তাঁর পারসীক পুস্তকচিত্রে এত কাব্যি জাগে। তিনি তো আর রজর্ ফ্রাই বা বেরেন্‌সন্ নন, সাহিত্যবিলাসী শিল্পবিলাসী তাঁর কবিকিশোরমন তাই যাযাবর ইরাণী ঘোড়সওয়ারকে যেখানে সেখানে

লাফাতে দেখে আত্মহারা হয় এবং তিনি মিশরী যুগের সাসানী মুদ্রাঙ্কিত এই প্রতীকটি বাংলা পটে খুঁজে পান ইরাণী প্রভাবের আরেকটি নমুনা হিসাবে। অবশ্য প্রতীকতত্ত্বে তা সমর্থন করবে না, এলিঅট স্মিথের বিস্তার প্রসারে বা রুথ্ বেনেডিক্টের ছকে এ প্রভাব অচল। তবে যাঁর আনন্দ শুধু বাক্যে, শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু স্বরাওআর্দির অজ্ঞাতসারে এই প্রতীক প্রস্তর যুগের মানবমনকেও নাড়া দিয়েছিল। আর তিনি বলেছেন মিশরীরা মগ্ন কালাতীত মুহূর্তের স্তব্ধতায়, চৈনিক ও পারসীকরা সৌখিনতায় ও কারিকুরিতে, এবং ইরাণীরা বিরাট স্থাপত্যাত্মক পরিকল্পনায়! বেশি কিছু নয়, ওএলি আর চাং ঈ-র সাহায্য নিলেই তাঁর বোধগম্য হত যে, চৈনিক শিল্পে আশ্চর্য সৌখিন ও সুকুমার নৈপুণ্য থাকলেও তাদের সাধনা ও সিদ্ধি কঠিন শক্তির সংহতিতে ও অতীন্দ্রিয় অধিদৈবত ব্যঞ্জনায় পেশী-অস্থির উচ্ছসিত প্রাণধর্মে। আর বিরাট স্থাপত্যগুণ ভারতীয় শিল্পেও প্রাপ্তব্য, মিশরে, অসীরিয়াতেও তা পাওয়া যায়।

তবে, স্বরাওআর্দির আনন্দ কল্পনাবিলাসে। নচেৎ অমরাবতীর সম্বন্ধে তিনি হঠোক্তি করবেন কেন? অথবা কুশনশিল্পে বিরাট পরিকল্পনা না পেয়ে বস্তুতান্ত্রিক তদ্‌গত কারিকুরিই বা পাবেন কি করে? কিম্বা সেজানের চরিতকারদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে সেজানের প্রভাঁসযাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ই বা আসে কি করে? ভারতীয় শিল্পে এবং চৈনিক শিল্পে তিনি জীবজন্তু ও মানবশরীর সম্বন্ধে অনুকম্পা না পেয়ে শুধু ইরাণী শিল্পেই তা খুঁজে পান। বিলেনস্কির মারফৎ তাঁর জানা দরকার যে নিরাসক্ত শুদ্ধ শিল্পীরা ও শিল্পজ্ঞরা ঠিক উল্টোকথাই বলেন।

আর ঐ ইরাণী যে কাল্পনিক, সেটা দুর্বল মুহূর্তে লেখক বলে ফেলেছেন—ইরাণী হয়ে পড়েছে, তাঁরই কথায় তুর্কী, শক, চৈনিক আদির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। তাই কড্রিংটন বা বাখ্‌হৌফেরের নির্মম মতের প্রতিধ্বনি না করেই পাঠকদের জানাই যে, স্বরাওআর্দি অন্তত ভারতীয় প্রজ্ঞামাত্রিক শিল্প বোঝেননি বা দেখেন নি। শিল্পজ্ঞান

ও স্বাভাবিক রুচিরসবোধ তাঁর এ বইয়ে শেষপর্যন্ত অনেকটা নঙর্থক।

এবং সেটা শুধু শিল্পে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ব'লে উপাদেয় ও আমাদের পক্ষে মূল্যবান প্রবন্ধ দুটিতে—On Theatrical Art ও The Modern European Stage-এও তার অর্ধসত্য মূলক প্রমাণ মিলবে। যথা, ভারতবর্ষে নাকি জীবনে ট্র্যাজেডি নেই, কারণ এখানে মানুষ ব্যক্তিসর্বস্ব নয়, সামাজিক জীব। তাই নাকি এখানে নাট্যে ট্রাজেডি নেই, তাই নাকি শান্তিনিকেতনে ও স্টার থিএটারে মর্মান্তিক ব্যর্থতা ও মৃত্যুর সঙ্গে জোটে অপ্রাসঙ্গিক গান ও নাচ। নাটকের জন্ম এদেশে নাকি ছায়ানাট্য বিদূষণ থেকে, বড়জোর না হয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বা রিটুআলসে আর গ্রীসে নাকি ব্যক্তিসর্বস্ব ডায়োনাসায় orgies থেকে, রিটুআলসে নয়। বলা বাহুল্য, আরিস্টটেলো মত যাঁরা মানেন না, সেইসব গ্রীকপণ্ডিতেরাও একথা ভ্রান্ত বলেন এবং orgies বা ভোগবিলাস সুরাওআর্দির কল্পনাকে যত চঞ্চল করুক, ডায়োনীসীয় গ্রীক দেবলোকে আসন পাবার পরে তাঁর উৎসব যখন হয়ে উঠল রিটুআলস্, তখনই তার থেকে নাটকের উৎপত্তি। আর ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নেই জানা যায় যে জীবনমৃত্যুঘটিত ভারতীয় সাধারণ্যসূচক ঈশ্বর, জন্মান্তর, কর্ম প্রভৃতি তত্ত্বের কারণেই ভারতীয় নাটক ট্রাজিকোত্তর। সাংবাদিকেরও এটা জানা উচিত।

বোধ হয় সংবাদপত্রের কথাটা অন্যায় হল, কারণ তারও গুরুদায়িত্ব আছে, তার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। বরং সুরাওআর্দি সাহেবকে বিদগ্ধ ভদ্রলোক বলাই সঙ্গত, অতিসভ্য বিশ্বমানবিক সমাজের নাগরিক ভদ্রলোক। শুনেছি এই শ্রেণী নাকি আজকাল অনেক প্রাচীন জন্তুর মতোই লুপ্তপ্রায়। এদের শেষদলের আত্মলীলা নাকি গত শতকের শেষভাগে, সপ্তম এডোআর্ডের যৌবনে। এই শ্রেণীর প্রতি কোনো কোনো মার্ক্সিস্টদের বা মার্ক্সবিরোধীদের মতো আমার কোনো বিরাগ নেই—যদি তাঁরা তাঁদের বৃন্দাবনেই আবদ্ধ থাকেন। এবং Prefaces-এর

ভূমিকায় সুরাওআর্দি যে তাই থাকেন তা জানা গেল। সত্যই উপভোগ্য তাঁর ধন্যবাদ ও বন্ধুকৃত্যের এই আবহ, যেখানে সত্যের চেয়ে চক্ষুলজ্জার খাতির বেশি। সমগ্র বইটির সার্থকতাই মনে হয় এই ভূমিকার জন্যে।

সুখের বিষয়, কবিতাতে সুরাওআর্দি লক্ষ্মণের গণ্ডীতেই আবদ্ধ। ইংরেজী কবিতার বিরাট ও গভীর ঐতিহ্যের দরুণই হোক বা কবিতায় এ দেশী অধ্যাপকোচিত পাণ্ডিত্যপ্রমাণ অনাবশ্যক বলেই হোক্, তাঁর কবিতার বইটি বিনীত ও সুখপাঠ্য। বইটির ছাপাও পাঠকের সহায় হয়, যেমন এই ছাপার পার্থক্যেই কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা বিদ্যায়তনের তুলনাও সহজ হয়ে ওঠে।

জনসাধারণের রুচি

"যাকে এক ভঙ্গীতে আকস্মিক বা এলোমেলো ঘটনা মনে হয়, আরেক দিক থেকে তাই স্ট্যাটিস্‌টিকাল বা সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়মে প্রকাশিত।

নিউটনীয় বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভরতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা এখন সমষ্টি-জীবযৌথ ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় রূপান্তরিত।······যুদ্ধের আগে থেকেই উদারনীতিক ভাববাদীয় বিজ্ঞানের চিত্র কল্পনাবিলাসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রায় লুপ্ত জীববিশেষ।"

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একবার নিখিল ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানের সম্মেলনে বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের সত্য যেমন একহিসাবে সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে সমীকৃত তত্ত্ব, তেমনি সংখ্যাবিজ্ঞানের তথ্যপ্রমাণ রসদ জোগায় আধুনিক মানুষের উন্নতির পরিকল্পনায়। ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগার এরই মধ্যে, ১৯৩৫-৬ থেকে ১৯৪২-৪ অবধি প্রায় ১১৫৯ তথ্যানুসন্ধান এবং নানাবিধ বড়ো সুমারের কাজ করেছে। দেশের লোকের মধ্যে এ কাজের গুরুত্ববোধ কেন এত কম জানি না। বিজ্ঞানাগার অবশ্যই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নয়, ফলে তার আত্মসম্মান প্রচারকার্যের উঞ্ছবৃত্তিতে শেষ হয় না। কিন্তু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় নৈরাশ্য কমবে আর বৈজ্ঞানিক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্য আমরা নানাদিকে গ্রহণ করতে পারব। তত্ত্ব ও তথ্য, জীবন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই এ বিজ্ঞানের কাজ, প্রত্যক্ষের সমস্যায় এখানে রাশি-প্রত্যয়ের কূটচর্চা হয়। বলা বাহুল্য, আমরা বিজ্ঞানের অর্থে বিদ্যালয়ের নিরালম্ব মৃত ও নিরাপদ জ্ঞান বুঝি না। জে, ডি, ব্যর্ণলের ভাষায় বহুকাল হল বিজ্ঞানের সীমা প্রসারিত। বিজ্ঞান এখন হয়েছে উপাদান যন্ত্রের ও কৃষির একাত্ম অংশ। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে এর হাত,

ব্যবসায় ব্যাঙ্ক অপিসে সরকারী কাজেও বিজ্ঞানের নির্দেশ। বিজ্ঞানের বিধিব্যবস্থাগুলি আর মনোনীত ভাবগুলিই একালের চিন্তা ও কর্মধারার রূপ নির্ণয় করে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগারের অনুসন্ধান ও সুমারির যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে এই ব্যবহারিক সার্থকতা স্পষ্ট হবে, ১৯৪১-এ অনুসন্ধানের মধ্যে কৃষি সমস্যা ৮১, নৃতত্ব ৩, অর্থশাস্ত্র, ৩০, শিক্ষা ১৭, বন ৭, যন্ত্রশিল্প ১১, গণিত ১২, স্বাস্থ্য ২০, আবহতত্ব ও জলসেচন ১৪ এবং অন্যান্য বিষয় ২০টি ছিল।

শুধু ব্যবহারিক সার্থকতা ধরলে নিঃসন্দেহ অন্যায় করা হবে। মহলানবিশের নেতৃত্বে সমীকৃত বিস্তার নিছক বৈজ্ঞানিক অবদান, নমুনা-সুমারের পদ্ধতির বিকাশও বিজ্ঞানজগতে কল্কাতার দান। আজকে শুধু জনসাধারণের রুচিসন্ধানে যে তিনটি সুমারি হয়েছিল, সাহিত্যের সামাজিক ঝোঁকে তার বিশেষ দাম ব'লে সে বিষয়ে সামান্য কিছু আলাপ করা যাক।

২

প্রথমত, এ রকম কাজ যখন জড় প্রকৃতিতে সন্ধান হয়, তখন যেমন নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্যই সন্ধানীর উপজাব্য হয়, তেমনি ব্যক্তি বা মানুষের সমাজঘটিত সন্ধানে একটি মূল্যস্বীকার আরম্ভেই করণীয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯৪১ সালে মডর্ন রিভিউ-তে জনরুচি বিষয়ে প্রবন্ধে এই পুরুষার্থ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। ব্রাইসের মতো সকলকেই মানতে হয় যে অতি দীর্ঘ কাল স্বীকার বা অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজ জনসাধারণের অধিকার কিছুতেই ভুলতে পারে নি। পারেনি বলেই তাকে গ্রীসে দাসপ্রথা গড়তে হয়েছে, ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের বিস্মৃতিকৌশল তৈরি করতে হয়েছে। কালস্রোতে ভেসে যায় সবই, শুধু থাকে জনসাধারণ, মৃত্যুহীন নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিসমষ্টি।

এ কথা স্বীকারের পরে জনসাধারণের সাধারণ্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হবে না। এবং এই আর্যসত্যের উপরে সংখ্যাবিজ্ঞানের নমুনা-সুমারের

ভিত্তি। দশহাজারের ভিড়ে তাই দুশো লোকের মন্তব্য শুনলেই রিপোর্ট যথাযথ লেখা সম্ভব। কথা উঠবে সাংবাদিকের দলীয় দৃষ্টি যাবে কোথা? আর, ঐ দুশো লোক হয়তো হবে এককোণে ভিড় ক'রে ব'সে একটি দল। প্রতিকার সহজ। প্রথম কথা, একজন সাংবাদিকের একপেশে মন্তব্য এখানে মানছি না, মানছি বিশজনের ভিন্ন দৃষ্টি, পরস্পরকে কাটাকুটি ক'রে যেটা একটা ভারসাম্য পায়। তাছাড়া আছে সতর্ক হিসাবের ছক, যাতে একই জিজ্ঞাসায় বিশ জন লোক বিশটি এলাকায় বা আলাদা ভাবে চল্লিশটি এলাকায় ঘুরবে। স্বেচ্ছায় নয়, অতিসতর্ক ছকের নির্দিষ্ট এলোমেলো হিসবে। কথাটা উঠবে, ঐখানে এলোমেলো কি হিসাবে প্রতিনিধি? কাপড়ের নমুনা যে হিসাবে, এক চুপ্‌ড়ি আমের উপরে নীচে এপাশে ওপাশে যে কোনো পাঁচটা যে হিসাবে। পক্ষপাত সম্ভাবনা দূর করবার জন্যই এলেমেলো বাঁছাই।

১৯৪১-এ জনরুচি সুমারে তিনটি ভাগ করা হয়েছিল—

(ক) থ্যাকারের রাস্তার নির্ঘণ্ট থেকে কল্‌কাতায় খাপছাড়াভাবে বাছাই করা হয় ১৫০৩টি পরিবার বিস্তৃত প্রশ্নমালার উত্তরের জন্য।

(খ) অল্‌-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে ৮৩০ জন রেডিও লাইসেন্সী ধরা হয় একনম্বর সাধারণ সুমারের এলাকা থেকেই। তাতে ফলাফলের তুলনা করা সম্ভব হয়েছিল।

(গ) হ্যারিসন ও ম্যাজ্‌ প্রবর্তিত বিলেতি ম্যাস অবসর্ভেশন ধরণে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও আলাপের মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল মুখ্যত মিত্রশক্তি, নিরপেক্ষ (১৯৪১ সালে নিরপেক্ষের সংখ্যা কিছু ছিল, সুইডেন তুর্কী ও স্পেন ছাড়াও, যারা বোধহয় আগামী বৎসরে মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগদান করবে) এবং অক্ষশক্তির বেতার-বার্তা বিষয়ে এতে কল্‌কাতায় ৩৮৬ জন লোক পরীক্ষা করা হয় এবং জগদ্দলে ১০১ জন। দ্বিতীয় সুমারে কল্‌কাতা ছাড়া জগদ্দল এবং আসানসোলেও গণনা হয়েছিল।

সংস্থানের দিকে, কল্‌কাতায় সমস্ত ক্ষেত্রটি ছটি ভূগোল-এলাকায় বা মহলে ভাগ করা হয় এবং খবর আনেন প্রতি মহল থেকে তিনটি ভিন্ন সন্ধানী দল। ফলে একই মহল থেকে তিনটি স্বাধীন তথ্যের ত্রিবেণী পাওয়া হায় এবং সমস্ত ক্ষেত্রটাতে তাই খানিকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ফলাফল সংগ্রহ করা যায়।

একচল্লিশের ২০শে মার্চ রেডিও লাইসেন্সের ফর্দ লেবরেটরিতে পৌঁছায়। দু'সপ্তাহ কাটে নমুনার পদ্ধতিটা ঠিক করতে, অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে পরিবারগুলি আর লাইসেন্সীদের বাছাই, এবং ক্ষেত্রকার্যের ছক তৈরী করতে। ১৬ই এপ্রিল তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ ও ছয় সপ্তাহে শেষ হয়। ফেব্রুয়ারি মার্চে ছোটখাটো সংগ্রহের পরীক্ষা করে দেখা হয় পূরোসময়ের কর্মী দিয়ে। তারপরে চেষ্টা করা হয় বাইরের স্বেচ্ছাকর্মীর সাহায্য নেবার। দুটোর কোনটাই সুবিধা না হওয়ার কাজ ও অর্থব্যয় বিবেচনার পর শেষে লেবরেটরির কর্মীদেরই খণ্ডকর্মী হিসাবে প্রয়োগ করা স্থির হয়। বিবেচনা করেই কর্মীর সংখ্যা বেশি করা হয়েছিল: কল্‌কাতায় জনপঞ্চাশেক, জগদ্দলে ৫ জন, আসানসোলে ৪ জন। সংখ্যাধিক্যের একটা সুবিধা হচ্চে তথ্যসংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত মতা-মতের পক্ষপাত এতে পরস্পরকে নাকচ করে। তাছাড়া বেশি লোকের কাজটা জানা হয়ে থাকে, যাতে করে ভবিষ্যতে যোগ্যতরদের বেছে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নতালিকার উত্তর সংগ্রাহকেরা লিখেছেন পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে। এই উত্তরই ব্যবহার করা হয়েছে যদিচ একই পরিবারে ইচ্ছুক অন্য ব্যক্তিদেরও উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে পারিবারিক তুলনা এ কাজের বাইরে। ইতিমধ্যে বিশেষ সতর্ককার সঙ্গে জনতানিরীক্ষার কর্মী বাছাই করা হয় সাধারণ বুদ্ধি ও শিক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা, বিবেচনা ও সামাজিকতা ইত্যাদির দিক থেকে। এ কাজ কলকাতায় করেন আংশিক সময়ের কর্মী ২২ জন জগদ্দলে পূরো-

সময়ের একজন। মে-র শেষ সপ্তাহে ও জুনের প্রথমে এ নিরীক্ষা সমাধা হয়।

তখনকার বড়ো খবর ছিল রুডল্‌ফ্‌ হেসের ইংলণ্ডে অবতরণ এবং জর্মানির সঙ্গে ভিশি-র বশ্যতাব্যবস্থা। বল্কান্‌ অঞ্চলে তখন জর্মান জয়যাত্রা। স্বদেশে তখনো সাতটি প্রদেশে লাটের শাসন চলছিল এবং কংগ্রেসের দাবিদাওয়া মেটেনি। তারপরে যুগোশ্লোভিয়ার পতন, আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সাফল্য, ইরাকে গোলমাল ও তৈলনলপথের ইংরেজের অধিকার, স্টালিনকে প্রধান মন্ত্রীপদে আরোপ, ক্রীটের যুদ্ধ, এবং এ পক্ষে হূড্‌ ও পক্ষে বিস্‌মার্ক জাহাজ ডুবি। পাট আর আকের পোকার দুটি বিপুল সুমারির মধ্যে লেবরেটারীর কর্মীদের এ কাজ করতে হয়েছিল, সে হিসাবে কাজটা বেশ দ্রুত বল্‌তে হয়।

মোটামুটি, নমুনাগুলি মধ্যবিত্তশ্রেণীতেই আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, ক্যরণ বেশীর ভাগ কর্মীই শুধু এই শ্রেণীর পবিচয় রাখতেন। তাছাড়া এই শ্রেণীই জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয়। খবর নেওয়া হয়েছিল নিম্নোক্ত বিষয়েঃ মেয়ে কি পুরুষ, বয়স; অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা; ধর্ম; মাতৃভাষা; শিক্ষা; জীবিকা বা কাজ; এবং আর্থিক অবস্থা,—শেষেরটি রোজগার কতো এ অপ্রতিভ প্রশ্নের বদলে মাসিক সংসার খরচার হিসাব। রেডিও রিপোর্টে বিশেষ ক'রে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা এবং জীবিকার কি প্রভাব পছন্দ অপছন্দ নির্দিষ্ট করে, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়। অক্ষশক্তি মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধের বেতার সংবাদে রুচিভেদ আলোচনায় ধর্ম, ভাষা এবং প্রদেশও বিচার্য।

৪

রিপোর্ট থেকে সামান্য কিছু তথ্য-আলোচনা হয়তো পাঠকদের ধৈর্য্য চ্যুতি করবে না।

প্রথমে রেডিও ও দৈনিক সংবাদ ধরা যাক্‌। কল্‌কাতায় সংবাদে অনুরাগ দেখা গেল পুরুষের মধ্যে শতকরা ৯১, মেয়েদের মধ্যে ৮৬।

শুধু রেডিও থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৩৫, মেয়ে ৪৪। খবরের কাগজ থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৬০, মেয়ে ৩৯। আর্থিক হিসাব এখানেও খাটে। ৪০ টাকা মাস খরচার দলে রেডিও সংবাদ শোনেন শতকরা ১৭ এবং ৪০০ টাকার উপরের ভদ্রলোকেরা শতকরা ৪১। খবরের কাগজে খবর চান পুরুষ ৭১, মেয়ে ৩৫। সব সুদ্ধ রেডিও শোনেন মেয়ে শতকরা ৩৬·৪ এবং পুরুষ মোটে ১৯·৬। তেমনি আবার কখনও রেডিও শোনেন না, এমন মেয়ে শতকরা ৩৬·৪ আর পুরুষ ১৯·৪। মেয়েদের গার্হস্থ্যই অবশ্য এই দুয়ের কারণ। এখানে বলা ভালো যে সাধারণ রুচিসুমারের প্রশ্নমালার একটি হচ্ছে রেডিও নিজের ঘরে, পথে বা দোকানে কোথায় শোনেন। মোহনবাগান ঈষ্টবেঙ্গল খেলার খবর শ্রবণরত ভিড় পথে ঘাটে দোকানের সামনে সন্ধ্যাবেলার সাধারণ দৃশ্য। বলাই বাহুল্য, কম মেয়েই বাড়ীতে রেডিও না থাকলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে রেডিও শোনেন। আর গল্পগুজব থেকে সংবাদ পান শতকরা ১৯·৪ অন্তঃপুরিকা, ম্যাট্রিকপূর্ব ২২·২ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শতকরা ২০·৫ এবং চল্লিশ টাকার তলায় ১৮·৪। বয়সের সঙ্গে রেডিও-সংবাদে আবেদন কমে, শোনায় ও চাহিদায় দুয়েই, যেমন বৃদ্ধি পায় আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে।

৫

এবারে রেডিও ও আমোদপ্রমোদ ধরা যাক্। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন এই তিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। রেডিওর কপালে পুরুষ শতকরা ৪৬·৭ এবং মেয়ে ৫১·১ পাওয়া গেল, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সিনেমায় যাতায়াত আছে এবং গ্রামোফোনের শ্রোতা মাত্র শতকরা ১৭·৮। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও-র প্রমোদশক্তি এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না; চাকুরিয়া গৃহস্থের সকাল-সন্ধ্যা খানিকটা গার্হস্থ্য-জড়িত, খানিকটা বিশ্রাম ঘটিত অভ্যাস। এ হিসাবে রেডিও-র আরো চল্‌তি হওয়া উচিত। না হওয়ার বড়ো কারণ ভারতীয় দারিদ্র্য। এবং

নিশ্চয়ই ইওরোপীয় অর্থে, একটি দম্পতির সাংসারিক সম্পূর্ণতা আমাদের দেশে এই সবে আসছে। এখনও ভারতবর্ষে ব্যক্তির স্বয়ম্ভরতা জাতীয় অভ্যাসে দাঁড়ায় নি, এদিকে যেমন আমাদের পব্লিক জীবন ব্যক্তিগত তেমনি অন্যদিকে প্রাইভেট জীবন পুরানো পঞ্চায়েৎ আর একান্নবর্তিতার জেরে আত্মীয় কুটুম্বের প্রতাপে প্রায় প্রকাশ্য বললেই হয়।

সেই জন্যই কি গৃহকর্তার কর্তৃত্বের সুযোগে রেডিওর ব্যবহার বয়সের সঙ্গে বেড়ে চলে? কারণ টেব্‌লে মাননির্ঘণ্টে দেখা যায় যে শিক্ষার তারতম্যে এখানে প্রায় কিছুই আসে যায় না। সিনেমার প্রায় সমান চল্‌তি সব শ্রেণীতে। গ্রামোফোনের দুর্গতিতে দুঃখ লাগ্‌লেও অবাক্ হই নি। গৃহস্থের স্বাধীন উপভোগ বর্তমান লেখক ও তার অনেক বন্ধুদের কাছে গ্রামোফোনেই সম্ভব, পছন্দ-সই ভালো রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায় প্রচুর, শুদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত আর তার চেয়ে অনেক বেশি ইওরোপীয় সঙ্গীতের। কিন্তু এখানে দেখা যায় মনিহারী দোকানদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-জগতে গ্রামোফোনের সব চেয়ে খাতির—শতকরা ২৬।

আবার যদি শোনা আর শুনতে চাওয়ার তুলনা ধরা যায় তাহলে দেখা যায় বয়স, শিক্ষা অর্থ বা কর্মস্থানে নির্বিশেষে আরো বেশি সিনেমা যাবার এবং কম গ্রামোফোন ব্যবহারের বাসনা সুলভ। অভ্যাস নয়, পছন্দের দিক থেকে সিনেমা রেডিওর চেয়ে জনপ্রিয় বলা যায়।

৬

রেডিওর নমুনা-সুমারের বিষয়ে কিছু বলা দরকরে। সে সময়ের রেডিও আর্টিস্টদের পুরো তালিকা দেওয়া হয় প্রশ্নপত্রের এক পিঠে, অন্য পিঠে নানা দফায় প্রশ্ন ছিল। যথা, রবীন্দ্র সঙ্গীত আধুনিক সঙ্গীত, বক্তৃতা, ওস্তাদী সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি। "প্রায়ই" শোনেন না, কি "মধ্যে মধ্যে" শোনেন, "কদাচিৎ" বা "কখনো নয়"। তাছাড়া দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "আরো বেশি" না "আরো কম" শুনতে

শুনতে চান। প্রশান্ত বাবু ১৮ দফায় প্রশ্নগুলির বিচার করেছেন। সংক্ষেপে

যুদ্ধের খবর	শতকরা	৭৭·৪
মন্তব্য	”	৭৪·৫
আধুনিক সঙ্গীত	”	৭৮·৪
রবীন্দ্র ”	”	৭৪·৪
যন্ত্র ”	”	৭৩·৪
নাটক	”	৬৮·৮
ধর্ম সঙ্গীত	”	৬৬·৩
ওস্তাদী-সঙ্গীত	”	৩৫·১

-ব্যক্তি শোনেন। অবশ্য এর মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, যেমন সম্ভব দিনক্ষণের প্রভাব। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় সব সময়ে সব দফা থাকে না, তাতে শোনার সুবিধা অসুবিধা নিশ্চয়ই কমে বাড়ে। নাটক যদি দুপুরে দেওয়া হত, তাহলে শতকরা ৬৮·৮ গৃহস্থেরা ঘুম বাদ দিয়ে আর চাকুরিয়ারা অফিস কামাই ক'রে, কল্‌কাতা বেতারের বিখ্যাত নাটক বা সঙ্গীতের ইতিহাসে কল্‌কাতার কিম্ভুত সৃষ্টি "আধুনিক ভাবগীতি" শুনতেন কিনা সন্দেহ। গ্রাম্য সঙ্গীত, শিশু ও মহিলা আসর, সঙ্গীত শিক্ষা আর গ্রামার্থে অনুষ্ঠানগুলি যে কল্‌কাতায় এত অপ্রিয়, তার মধ্যেও নিশ্চয় এ দুই কারণ বর্তমান। বোঝা শক্ত সঙ্গীতশিক্ষা কার উদ্দেশ্যে? তাছাড়া আমাদের নমুনায় শিশু, মহিলা ও গ্রাম্যজন কমই ছিল। তবে রেডিও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, থেকে থেকে রেডিও অফিসে রাজ-বংশের পরিবর্তন, বা তাঁদের বন্ধুবৎসলতা এ সবই নমুনা-সুমারের বাইরের ব্যাপার। তথ্যসংগ্রহে ঔচিত্যের পক্ষপাত নেই।

তাছাড়া অর্থের নানা দিক ধর্তব্য। বয়সের তারতম্যে রুচির পরিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক সঙ্গীত শতকরা ৭০·৮ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্বে ১২·২-তে পরিণত হয়, রবীন্দ্র সঙ্গীত ৬৬·৬ থেকে ২১·২। কিন্তু ভক্তির

দাম বয়সে বাড়ে, ধর্ম সঙ্গীত ২৫'০ থেকে ৫১'৫-তে ওঠে। ওস্তাদী গান আঠারো বছরের কনিষ্ঠদের মধ্যে শ্রোতা পায় শতকরা ১৬'৭, উনিশ থেকে পঁচিশ বছরের যৌবনে পায় ২৯'৯ এবং পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়সে নেমে যায় ১২'১-এ। যাকে রেডিও স্টেশনে তাঁরা হাস্যকৌতুক বলেন, সে দফা শতধারা ক্লিওপেট্রার মতোই বয়সে শুকোয় না। শিক্ষার সঙ্গে স্বভাবতই বক্তৃতাগুলির আদর বাড়ে। আধুনিক সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমাজে যথাক্রমে বেশি ও কম এবং বৃত্তিজীবী সমাজে কম ও বেশি, চলে। মেয়েরা যে এত বেশি ঘরে ব'সে সাপ্তাহিক নাটক শোনেন, তার কারণ অবশ্য বাংলা-ভাষায় রেডিও নাট্যের উন্নতি নয়।

৭

রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে নৈরাশ্য এত গভীর যে অনেকেই কম বেশি চাহিদার দফায় নিরুৎসাহ। সবই যেন কল্‌কাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন প্রতিশ্রুতি, কিন্তু এই ভোট না দেওয়ার ব্যাপারেও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্ধেকের বেশি লোক সংবাদ ও মন্তব্য বিষয়ে চাহিদার কম বেশি জানিয়েছেন, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি আলাপ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন, শতকরা ৭০-এর বেশি লোকের রেডিওর শিশু, মহিলা আর গ্রাম্যজন অনুষ্ঠান বিষয়ে কোনো উৎসাহ নেই। আবার আধুনিক ভাবগীতি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত ভোট পেয়েছে শতকরা ৫০-এর বেশি লোকের কাছে। ভোট গণনায় যথাক্রমে দেখা যায় চাহিদা বেশী আধুনিক গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নাটক, যুদ্ধের খবর, এবং ধর্ম সঙ্গীতের। ওস্তাদী গানের সময় গড়পড়তায় দেখা যায় লোকে আরো কমাতে চায়। প্রসঙ্গত, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে মহিলা অনুষ্ঠান, আধুনিক ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নাটকের ভক্ত। আর তাঁরা খবর বক্তৃতা এসব বিশেষ পছন্দ করেন না। বয়স, শিক্ষা ও পেশা অনুসারে এই সব চাহিদার নানা রকম তারতম্য ঘটে। পঞ্চাশোর্ধ্বে যেমন ভক্তিমার্গে মন যায়, ম্যাট্রিক পাস করার পরে

তেমনি যুদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্য, বিদেশী সংবাদ, বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দাবি বৃদ্ধি পায়। ঐ সব দফায় দেখি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অনুরাগ নেই, তাঁদের উৎসাহ নাটকে ও ধর্ম সঙ্গীতে। বৃত্তিজীবীরা তার বিপরীত। ছাত্রেরা প্রায় সব দফাতে ক্ষুধার্ত। এবং এই চাওয়ার ক্ষমতায় ভূসম্পত্তিবানেরা ছাত্রের পরেই। ওস্তাদী গানের একমাত্র ভক্ত কিন্তু ভূসম্পত্তিবানদেরই বলা যায়, ওস্তাদী ঐতিহ্যের অবশেষ ও সময়ের প্রাচুর্য তাঁদের হাতে বলেই সন্দেহ নেই। গায়কের যে দায়িত্ব রূপায়নে বা ইণ্টরপ্রিটেশনে, সে দোভাষী দায়িত্বও বলা বাহুল্য ওস্তাদী গানে বেশি, যেমন বেশি রবীন্দ্র সঙ্গীতে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সৌকুমার্য গায়কগায়িকা সমাজে সুলভ, কিন্তু কণ্ঠশক্তির সাধনা ও ব্যক্তিত্বের আবেগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও রূপায়নে একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু, কবির ব্যক্তিস্বরূপের প্রবল পটভূমির বোধেই সার্থক তাঁর গানের সুকুমার ব্যঞ্জনা।

৮

আঠারো দফার মধ্যে পাঁচটি সবচেয়ে বেশি পছন্দসই দফা কি, এ প্রশ্নের গড়পড়তা উত্তরে প্রথম স্থান হল আধুনিক গীতি নামক দফার, শতকরা ৫০·৬। রবীন্দ্র সঙ্গীত ৪২·৮, নাটক ৩২·৯, যন্ত্রসঙ্গীত ৩৩·২, ধর্ম সঙ্গীত ৩১·১, যুদ্ধের খবর ৩২·০ এবং বাকিগুলি পরীক্ষায় বিকল বললেই হয়।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে শোনা এবং চাহিদার মধ্যে প্রভেদ। যুদ্ধ সংবাদ শোনেন অনেকে, কিন্তু শ্রবণেচ্ছু সংখ্যায় কম। সঙ্গীত শিক্ষার দফাতেও তাই। এ দুটি ঠিক সময়হরণার্থে প্রমোদও নয়। ওদিকে, নানাবিধ সঙ্গীত ও নাটকের বেলায় শোনার চেয়ে চাহিদা বেশি—হয়তো এগুলিকে আরো শ্রাব্য আর আরো সুবিধাকর সময়ে করা যেতে পারে ভেবে। রবীন্দ্র সঙ্গীত চাহিদার প্রমাণে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কিন্তু শোনার কপাল গুণে ষষ্ঠ। এর কারণ কি শিল্পী নির্বাচন আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাগে অতি অল্প সময় বিতরণ? প্রশ্ন-

পত্রগুলি ঘাঁটালে মনে হয় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব শিল্প দফার মহিমা বা মহিমার অভাব অনেকে সময়ে নির্দিষ্ট করে। গ্রাম্যসঙ্গীতে নিরুৎসাহ কল্‌কাতাবাসিনী তাই দেখি আব্বাস-উদ্দীনকে নম্বর দেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারাণী প্রভৃতি শিল্পীবিষয়েও পক্ষপাত দ্রষ্টব্য।

৯

রেডিও-র দাম ও মেক্ মিলিয়ে দেখলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনের বেতার স্পষ্টতার উত্তরটি বেতারযন্ত্রকর্তার কাজে লাগতে পারে। দশটি বিদেশী, দশটি ভারতীয় বেতার কেন্দ্র বিষয়ে চারটি জিজ্ঞাসা ছিল: ভালো শোনা যায় কি চলনসই শোনা যায়, অস্পষ্ট না একেবারে শোনা যায় না। কলকাতার সুমারে স্বভাবতই স্থানীয় কেন্দ্র প্রথম হয়েছিল—শতকরা ৯০। দিল্লী শতকরা ৪১। তারপরে একেবারে সমুদ্র পারে যেতে হয়, তৃতীয় স্থান বি-বি-সি-র। চতুর্থ বোম্বাই। বিদেশী ফর্দে লণ্ডনের পরে আসে বের্লিন, টোকিও, চুং কিং। ইণ্ডোচায়না শতকরা ১৬·২, ফ্রান্স ১৩·০, সোভিএত য়ুনিঅন ১২·৫, তুর্কীর শ্রোতা কল্‌কাতায় শতকরা ৮·৪।

এরপরে আমার সংক্ষিপ্তসারে অক্ষ, মিত্র ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আসা যাক্। এ সন্ধানে অনেকেই জবাব দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নি। তবু কল্‌কাতায় শতকরা ৬০ আর জগদ্দলে শতকরা ৬৭ জনের মতামত পাওয়া যায়। প্রশ্ন ছিল তিনটি পক্ষের বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে—ইনটরেষ্টিং, বিশ্বাস্য এবং প্রপাগাণ্ডা হিসাবে সার্থক কি-না।

মনে রাখবেন সময়টা ১৯৪১। কাজেই বেশী লোকের কাছে যে শত্রুর বেতার ঘোষণা মনোজ্ঞ বিশ্বাস্য, তাতে আশ্চর্য কি? অনেকের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আর্থিক প্রাদেশিক ও ভাগ ফলটা! রেওয়াজ যে বাংলাদেশেই জর্মান প্রীতি সমধিক ছিল নিম্ন এবং মধ্যবিত্তে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার উপরতলায় বেশি আস্থা

ছিল বটে নিরপেক্ষ বেতারবার্তায়, তবে মাসিক চারশো টাকার উপরে গেলে ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা, সত্যবাদিতায় ভক্তি বেড়ে ওঠে। আবার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে মিত্রপক্ষ ও নিরপেক্ষ বেতারে আস্থা বর্ধমান। যুক্তিযুক্ত ভাবে বৃত্তিভোগী বা পেশাজীবীরা নিরপেক্ষ সংবাদে নির্ভর করেন, তারপর মিত্রশক্তির আত্মপ্রচারে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা বিনাকর্মে কালাতিপাত করেন, তাঁরা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বহুবিধ বাঁধা চাকুরিয়া নিছক মিত্রশক্তির অনুরাগী। মেয়েদের কৌতূহল কিন্তু নাৎসি আবেদনে। মুসলমান নমুনা সংখ্যায় সামান্য হলেও, প্রতিনিধিমূলক বলা যায়। মুসলমান প্রতিক্রিয়া শত্রু বেতারের পক্ষেই গিয়াছিল। তেমনি অবাঙালীর সংখ্যা সুমারে কল্‌কাতাতে কম হলেও মতামতের তারতম্য বিস্ময়কর। হিন্দি, উর্দু ও মারাঠি ভাষীরা দেখা যায় বাংলা-ভাষীর চেয়ে বেশি রকম অক্ষশক্তিকে বিচক্ষণ ভাবেন। প্রাদেশিক ভাগে এই সংক্ষিপ্ত টেবলটি পাঠকের কৌতূহল জাগাতে পারে :

	মনোজ্ঞ			বিশ্বাস্য			সার্থক প্রচার		
	শত্রু	মিত্র	নিরপেক্ষ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ
আসাম	১০০	০	০	১০০	০	০	৫০.	০	০
বাংলা	৫৪.৮	২৮.	১৭.২	৫৪.৯	১৮.৯	২৬.২	৬১.	২৮.৫	১০.৫
বিহার	৯১.৩	৬৭.	০	৮৬.৭	১৩.৩	০	৯২.৯	৭.১	০
বোম্বাই	৬০.	২০.	২০.	৫৫.৬	৩৩.৩	১১.১	৮৮.৯	১১.১	০
মধ্যপ্রদেশ	৬৬.৭	৩৩.৩	০	১০০	০	০	১০০	০	০
মাদ্রাজ	০	১০০	০	০	০	০	০	০	০
পাঞ্জাব	১০০	০	০	৬৬.৭	০	৩৩.৩	১০০	০	০
ত্রিবাঙ্কুর	৭৫.	০	২৫.	৫০.	৫০.	০	৭৫.	২৫.	০
যুক্তপ্রদেশ	৭৬.২	১৪.৩	৯.৫	৬৩.৬	১৩.৬	২২.৭	৭৬.২	১৯.০	৪.৮

সাধারণভাবে বলা যায় যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া মোটামুটি বেশির ভাগ মতই অক্ষশক্তির বেতারবার্তার পক্ষে যাচ্ছে—বা ১৯৪১-এ যাচ্ছিল।

বহু কাজ এখনো করা যায় শুধু এই রেডিও সুমার নিয়েই। তাছাড়া জনরুচির সাধারণ সুমারে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান মিলবে। ইংরেজী লেখক সুচী, বাংলা লেখক সুচী, ইংরেজী ও বাংলা ফিল্‌ম্‌ সূচী মিলিয়ে বেশ সামাজিক মানস ও সংস্কৃতির ছক পাওয়া যায়। যিনি এড্‌গার ওয়ালেসের ভক্ত তিনি কি দীনেন্দ্রকুমার রায়েরই ভক্ত না অনুরূপা দেবীরও বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও? এমিল্‌ জোলা মারি আঁতোআনেৎ ও কিং কং কি করে একই সঙ্গে প্রিয় হয়? বা স্টীভন স্পেণ্ডর ও এডগার ওআলেস? আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের কৌতূহলও জাগতে পারে যেমন—বুদ্ধদেব বসু ও সজনীকান্ত দাসের খ্যাতি এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেনের আপেক্ষিক পাঠকের অভাব। তাছাড়া বিধবাবিবাহ, বিপত্নীকবিবাহ, স্বগোত্রবিবাহ ইত্যাদি বিবাহবিষয়ক বিস্তৃত আলোচনার বস্তু আছে। আরেক জিজ্ঞাস্য হচ্ছে বোম্বাই-এর কংগ্রেসের ঐক্য বিষয়ে এবং জাপানের ও আমেরিকান যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার বিষয়। খেলাধূলার রোজকার পাঠ্য খবরের কাগজের নাম, বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা বিষয়ে মতামত, চা কফি ইত্যাদি নেশা, এলোপ্যাথাদি চিকিৎসাপদ্ধতির পক্ষপাত। সাধারণ সুমারের একটি ভাগ হচ্ছে কোষ্ঠি-বিচার ও কর-বিচার: বিশ্বাস আছে কিনা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে মিলেছে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন। এর সঙ্গে লেবরেটরি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র সন্ধান হয়েছিল, দুই মিলিয়ে অসহায় বাঙালীর অতিপ্রাকৃতে আস্থার উপরে মূল্যবান একটি বই লেখা যায়। ১৯৪১-এ নমুনানুসারে দেখা গিয়েছিল যে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে দুই-তৃতীয়াংশ লোকের ঠিকুজী আছে এবং এক-তৃতীয়াংশের আছে গণনায় বিশ্বাস। ১৯৪২-এ এক শিশুসদনের ৩০০ শিশুর জন্ম ও অকালমৃত্যু গণনার সঙ্গে মেলানো হয়েছিল।

উপরের সামান্য আভাসেও বোঝা যাবে আমাদের জীবনের নানা সমস্যায় সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যের মূল্য কতখানি। বিংশ শতাব্দীর

মানুষের সমস্যা অভূতপূর্বভাবে বিরাট ও জটিল, তার সমাধানও কঠিন ও সমষ্টি-সাধ্য! তবু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কথাতেই শেষ করি:

কোনো সমাধান যে হতে পারে সে শুধু বিজ্ঞানের বৃত্তি ও বিজ্ঞানের নানা পদ্ধতির বিকাশের জন্যই সম্ভব। বিশ্বব্যাপী মানুষের পুনর্গঠনের বীজ এরই মধ্যে সেখানে রোপিত। আমরা আজ প্রয়োজনীয় যা কিছু দ্রব্য সবই তৈরি করতে পারি, বিতরণের ব্যবস্থাও আমাদের আয়ত্তে, বিতরণের জন্য দেশে দেশে যোগাযোগ নির্মাণ আজ সম্ভব। আর তার চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে বিজ্ঞানের আহরিত সেই জ্ঞান, যাতে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি, পরিমাণ করতে পারি একটা মানবসমাজের পরিবর্তনশীল নানা প্রয়োজনের মতো বিরাট ও জটিল তথ্য।

রিচার্ডসের কল্পনা

সম্প্রতি এজরা পাউণ্ডের প্রবন্ধ সংগ্রহে তাঁর কাব্যাদর্শের কথা পড়ছিলুম। তারপরে বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া পড়ে আশ্চর্য হলুম উভয়ের কাব্যাদর্শের অনগভীর মিলে। তাই বেণ্টামী রিচার্ড্স্‌ও যে নভশ্চারী কোলরিজে পাবেন তাঁর শ্রুতি, তাতে আর কি আশ্চর্য। রিচার্ডসের গভীর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও থিসিস্‌-জাতীয় পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। বইটি কোল্‌রিজ-ভাষ্য শুধু নয়, কোল্‌রিজ সংস্কারও বটে। কোল্‌রিজ কাব্য বলতে শুধু কবিতা বুঝতেন না; কাব্য মানবজীবনে পরম প্রয়োজন ও মূল্যবান এ বিশ্বাস তাঁর ছিল; রিচার্ডসেরও আছে। কাব্য সমগ্র মানবের সম্পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তির অখণ্ড চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তি, একথাও রিচার্ডস মানেন। কিন্তু এই মূর্তিলাভ ও তার প্রক্রিয়া পারলৌকিক লীলা কোলরিজের এ কথা মানতে তাঁর বাধে। রিচার্ড্স্‌ বলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছে আজ মৃত হলেও আমাদের মুক্তির প্রয়োজন উগ্রই আছে, এবং কাব্য সে মুক্তির ফোয়ারা বহন করবে, ঈশ্বর-মানার মতো অবৈজ্ঞানিক দাবী জারি না করে। পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়েছে, সভ্যতা দিশাহারা, মানুষ আজ ভ্রান্তির জীবনশোষক গোলকধাঁধায়, ধর্মপ্রেমআদি সব বিশ্বাসের আশ্রয় আজ ভেঙেছে, এখন অন্ধজনে আলো কে দেবে? না এই শিশুতীর্থের নবশিশু, কাব্য। অথচ কাব্য প্রাণ পেয়েছে বিজ্ঞানপূর্বজ ঐ সব বাতিল বিশ্বাসের আশ্রয়েই। অবশ্য এ বৈজ্ঞানিকমন্য নাটকীয় ভাব রিচার্ডসের এ বইটিতে কমেছে।

এবং রিচার্ড্স্‌ পাঠকের কাছে প্রায় সর্বদা যে বুদ্ধির জাগ্রত অবস্থা

Coleridge on Imagination : by I. A. Richards.
Poetic Experience—by Dom. Gilby.

দাবী করেন, এ বইয়ে তা না কমে বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণ সর্তকতা ও রুচিমণ্ডিত পাণ্ডিত্য স্বাস্থ্যকর। বহুকষ্টসাধ্য স্পষ্টতা বর্তমান বলেই তাঁর কথায় মতান্তর ঘটা সহজ, যদিও তাঁর সুবিন্যস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া শক্ত। অবশ্য কেম্ব্রিজের কূটবুদ্ধি পণ্ডিতের সঙ্গে কোলরিজের অনেক বিষয়ে মতৈক্য। কোলরিজের সঙ্গে রিচার্ডস্ বিশ্বাস করেন যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের চেতনা হয়ে ওঠে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাতীত মিলনে স্বচ্ছ। দুজনেরই মতে এই অসাধারণ অপিচ ক্ষণস্থায়ী দিব্যজ্ঞান অতিশয় মূল্যবান। সেণ্ট টমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগ-সাধনার যাত্রাপথ। কোলরিজও এর মধ্যে পেয়েছেন পরমার্থের ইঙ্গিত। এবং তিনজনেই—সেণ্ট টমাস অবশ্য কথাটা ব্যবহার করেননি—এর সঙ্গে দেখেছেন শুদ্ধ কল্পনার সম্বন্ধ। এই শুদ্ধ কল্পনা কোলরিজের মতো ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই জন্যেই নাকি শেক্স্পিঅর জেণ্টল্। গিলবি কিন্তু কবিদের জীবনে গোলযোগই দেখেন। তবে, আধুনিক কবিজীবনী লেখার রীতি কোলরিজ দেখেন নি, আর ভেরলেন, বদলেয়র প্রভৃতিও তখন জন্মান নি। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো যে কবি দার্শনিক সঙ্গীতকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানে কাজ চলেছে এবং কেন যে দিব্যজ্ঞানবান কবিতার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারে না, সে মানস-জাগতিক প্রশ্ন হয়তো একদা উত্তর পাবে। বিজ্ঞানের এ সিদ্ধি সম্বন্ধে রিচার্ডসের বিশ্বাস প্রচণ্ড—যদিচ তিনি মার্ক্সিস্ট বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে সমস্যার সমাধান পান নি।

কোল্‌রিজ শুধু এই বিজ্ঞানের বর্ণনায় ক্ষান্ত হন নি। এই জ্ঞানের মাত্রা যে সামাজিক সভ্যতার ওপর নির্ভর করে, সে সত্যও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চোখে পড়েছিল। এবং আত্মজ্ঞানের ফলই শুধু বুদ্ধিগত নয়, এ জ্ঞান একটা ক্রিয়া ও একটা নির্মাণ, আর এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে নবমূর্তিলাভে, নব আত্মপ্রকাশে। তার ফলে আসে শুদ্ধ

কল্পনা। রিচার্ডসের আয়াসসাধ্য পুনর্ভাষ্যে বুঝলুম যে কোলরিজের মতে এই সঞ্জীবনী কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপ কাব্য হলেও এ অক্ষয় বটের শুভফল অন্যত্রও ফলে। যা কিছু অভ্যাসজর্জর জীবযাত্রার একান্ত প্রয়োজন-সাধনের বাইরে, যা কিছু সুকুমার মানসক্রিয়া, তারই মধ্যে এ শুভের লীলা। সেণ্ট্ টমাসের মতে এই লীলার চরম ও শুদ্ধতম রূপ ঈশ্বরের প্রেমে। কুয়াশাচ্ছন্ন কোলরিজেরও এ রকম একটা ধারণা ছিল। এ বিজ্ঞানছাড়া ঈশ্বরের কথা রিচার্ডসের কাছে অসম্বন্ধ। তিনজনের মিল জীবন-যাত্রায় কাব্যের উচ্চস্থান সম্বন্ধে। কোলরিজ ও রিচার্ডস তো স্পষ্টত কাব্যকে জীবন-যাত্রার প্রধান সহায় বলেছেন। এবং বিকল্পনা বা কল্পনাবিলাসের মূল্য যে কম ও তার স্থান নিচে, এর কারণ বিকল্পনা আর শুদ্ধকল্পনার তফাৎ প্রায় ততখানি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া ও জড় অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মধ্যে যতটা। এই খানেই হার্ট্লিকে ছেড়ে কোল্‌রিজে কাণ্টের অনুগমন। এইখানেই ক্ষমতা-বানে প্রতিভাশালীতে ভেদ। এ-প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতায় কোল্‌রিজের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক রিচার্ডস একটু অসুবিধায় পড়ে একটা যাহোক তাহোক্ প্রাক্-নিয়ন্ত্রী বাখ্যা দিয়েছেন। অমার্ক্সীয় আধুনিক মনো-বিজ্ঞানে এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও নাই। এখানে রিচার্ডস্ সততা-সহকারে মেনেছেন যে ব্যক্তি ও বহির্জগতের সম্বন্ধ-সমস্যা শুধু বক্তি-বাদীকে বিচলিত নয়, বস্তুতান্ত্রিককেও ভাবিত করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ও উদ্ধৃতিবহুল এ আলোচনার আরেক কথা হচ্ছে কল্পনা-বিকল্পনার সঙ্গে বিকার বা ডিলিরিঅম ও মেনিআ বা উন্মত্ততার তুলনা। চলিত কথায় যে কবিকে পাগলের জাতে না হোক, মাথার ছিটওয়ালার দলে ফেলে, সে ভুল অবশ্য এ তুলনায় নেই। কারণ বিকল্পনা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হলেও কল্পনার স্পষ্ট তিলক হচ্ছে তার চিন্তাক্রিয়া ও সঞ্চয়ী স্মৃতির ঐশ্বর্য। বিকল্পনা এ-কল্পনারই জের তবে তাতে কল্পনার সত্য-চেতন অবৈকল্য নেই। সেই-জন্যেই কল্পনাবিলাস আমাদের অভিভূত করে না, করে চমৎকৃত। তার

উৎকৃষ্ট আলোচনা কোল্‌রিজ্‌ করে গেছেন গ্রে ও কূলির কবিতা নিয়ে ও ভিনাস এণ্ড অ্যাডনিস্‌ থেকে দুই জাতীয় কয়েকটি লাইন তুলে। সে উপলক্ষে রিচার্ডস্‌ উৎকৃষ্ট টীকা করেছেন। এ টীকা বিচারবুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগেও সার্থক। যথা ডিটেকটিভ নভেলকে রিচার্ডস্‌ বিকল্পনার পর্যায়ে ফেলেন, "টু দি লাইট্‌ হাউস্‌" বা "টম্‌ জোনস্‌"-কে কল্পনার। অথবা হার্ডির নভেলে তিনি পান খণ্ডে খণ্ডে কল্পনা কিন্তু সমগ্রে শুধু বিকল্পনা। অবশ্য এ ভেদজ্ঞান সহজ নয়। কারণ মানবমনে ঘটনা সব যে এক জাতের নয়, সে বোধের উপর এ ভেদজ্ঞানের ভিত্তি এবং ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই হবে না, জানতে হবে সমস্ত মনের হিসাবে। এবং তাও শুধু ব্যক্তিবিশেষের মনেই শেষ নয়, তার মেরু-দণ্ডরূপে থাকবে সর্ব মানবের বিশেষত্ব। অর্থাৎ আমরা এসেছি ভ্যালিউস্‌ বা পুরুষার্থের জগতে। এ মূল্যের ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার মার্ক্সীয় জটিলতায় রিচার্ডস্‌ নামেন নি। বলেছেন কল্পনাবিচারে সৌভাগ্যবশত মূল্য-মানদণ্ড না নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ সাধারণ সভ্যমানুষ মাত্রেরই কখনো না কখনো কল্পনার সঙ্গে দেখা শোনা হয়েছে। কিন্তু মুখচেনা জ্ঞানকে বিচারের ভিত্তি করলে যে ব্যক্তিনির্বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা হয় না, সে কথা বৈজ্ঞানিক রিচার্ডস্‌ চেপে গেছেন—মনোবিজ্ঞানের শৈশবের জন্যে বাধ্য হয়ে। অথচ সুধী কাব্যজ্ঞদের মধ্যেই মতভেদ আছে। গ্রে এবং কূলি সম্বন্ধে কোলরিজের কল্পনা-বিকল্পনা বিচার রিচার্ডস্‌ মানতে পারেন না।

অতঃপর শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা। শব্দার্থতত্ত্ব যে গভীর মেধায় চর্চনীয় বিজ্ঞান তা বলাই বাহুল্য। রিচার্ডস্‌ পূর্বে এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রদূত দুটি বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। কোলরিজের প্রাগাধুনিক আশ্চর্য দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টিও সেমাসিওলজির বিপ্লববহ মাহাত্ম্য দেখেছিল। কোলরিজের সেই নানা কারণে অসম্পূর্ণ তবুও মহান চেষ্টা থেকে রিচার্ডস্‌ শব্দার্থের রহস্য ধরবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যদিচ মোটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি পেয়েছে, একটু ভেতরে

গেলেই আমরা পড়ি আবার অন্ধকারে। অবশ্য শব্দার্থের রহস্যেতিহাস না জানলেও আমরা ফস্‌লের রিচার্ডস গ্রেভস্ এম্প্‌সনাদির সাহায্যে পূর্ণতর পাঠরীতি শিখছি। তাছাড়া সাধারণ ভাবে রিচার্ডসের আলোচনা যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও উপকারেই লাগবে। যথা, সব চেয়ে মোটা কথাই ধরা যাক্, কথা বা শব্দ সর্বদা অর্থৈকক বা স্বসম্পুর্ণ অর্থপিণ্ড নয়। এ জ্ঞান যে অনেকের নেই, তার প্রমাণ সুধী পণ্ডিত হর্বার্ট্ রীডের একটি বচন : কাব্য একটি কবিতায় বা একটি লাইনে বা একটি দুটি কথায় থাকতে পারে,—উদাহরণ, শেক্‌স্‌পিঅরের incarnadine, কীটসের shady sadness, কোলরিজের Mount Abora ইত্যাদি। অথচ ওষ্ঠরঞ্জনের বিজ্ঞাপনে incarnadine দিলে multitudinous seas লাল হয়ে ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে কল্পনা-বিকল্পনা প্রয়োগ শিরোধার্য। যেখানে এ মানস-ক্রিয়ায় উষ্ণ কথাগুলি সার্থক-সংযোগে কাব্য হ'য়ে ওঠে সেখানে পাই শুদ্ধকল্পনা। বিপরীতে অর্থাৎ কথার একক অর্থের, আভিধানিক অর্থের প্রাধান্য যেখানে, সেখানে বিকল্পনা। যথা এই শ্লোকে কথা-গুলির অর্থ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র :—

Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean

কিন্তু এ শ্লোকে কথার অর্থ অভিধান ফেলে সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে গেছে—

She looks like sleep—
As she would catch another Antony
In her strong toil of grace.

তারপরে কোল্‌রিজের "শুভবুদ্ধির" বিচার হল রিচার্ডসের আলোচ্য। এ শুভবুদ্ধির অস্তিত্ববিনা কল্পনা হয়ে ওঠে প্রলাপী বিকার, বিকল্পনা হয় মহাব্যসন। মুস্কিল হচ্ছে এই শুভবুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ে।

কোল্‌রিজ্‌ বিকল্পনাবিহারী কুলির যে পিণ্ডারীয় ওড-এ শুভবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব দেখছেন, রিচার্ডস্‌ তাতে বিকল্পনাই পেয়েছেন—যদিও নিচুদরের বিকল্পনা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে এক্‌সচেঞ্জের দর রিচার্ডস্‌ আজও বাঁধতে পারেন নি, কাজেই নিচু দর উঁচু দর অস্পষ্ট কথাই রইল। কোল্‌রিজের মতে এ শুভবুদ্ধি আসে ব্যাকরণ, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের সহজ বা জাত জ্ঞানে। এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হয়ে উঠতে পারে ক্ষমতা, পাওআর। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞান অদ্যাবধি পরিমিত। রিচার্ডস্‌ তাই ভাবীকালের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে বলেছেন যে একদা বিজ্ঞানের নিশ্চিত নিকষে কবিতার ভালোমন্দের নির্বিশেষ বিচার করা যাবে। ইতিমধ্যে তিনি মেনেছেন কোল্‌রিজকৃত Reason-এর জয়গানের জটিল সার্থকতা।

কোল্‌রিজের কবিতায় 'বায়ু-বীণা'র রূপক সবার পরিচিত। বায়ু বীণা নামে পরের অধ্যায়ে রিচার্ডসের সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হচ্ছে নিসর্গ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের দুটি মতবাদ। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত সে মত দুটি রিচার্ডসের কঠিন-শব্দ-সঙ্কুল নব বেশে হচ্ছে এই :—

The mind of the poet at moments, penetrating the film of familiarity and selfish solicitude, gains an insight into reality, reads Nature as a symbol of something behind or within Nature not ordinarily perceived। এবং The mind of the poet creates a Nature into which his own feelings, his aspirations and apprehensions, are projected.

রিচার্ডস্‌ স্থির করতে পেরেছেন যে অন্তত এ মত দুটি যথার্থ-ই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু সতর্ক বিচারে সাবধানী ভাষায় প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির চার রকম অর্থ ও তার বর্ণনা রিচার্ডস্‌ করেছেন। প্রথম অর্থে প্রকৃতি শুদ্ধ, মানব মনের আয়ত্তের বাইরে, স্বাধীন, দুর্জ্ঞেয় এবং মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ এ প্রকৃতিতে মানসলোক আরোপ করতে মানবীয় কল্পনা অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মানব মনের লীলাক্ষেত্র। এ লীলায় ভণ্ডামি নেই, কিন্তু যে সব রূপ গুণ এতে প্রকৃতির

উপরে আরোপিত হয়, তারা সব mythical বা পৌরাণিক। রিচার্ডসের এক অধ্যায় হলো পৌরাণিকের সীমানির্দেশ। যাঁরা fiction-এর সঙ্গে ও রিচার্ডসের বিশ্বাস বা belief-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এ অধ্যায়ে খুশি হবেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবন-যাত্রায় একান্ত প্রয়োজন এই সব বিশ্বাসকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়ে রিচার্ডস্ আমাদের অন্ধ পৌত্তলিক বলেন নি। কারণ এসব পুরাণেই আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। এদের অনুবর্তনেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সংহত, মানস তথা ইন্দ্রিয়শারীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও আমাদের বিকাশ সমঞ্জস হয়। একান্ত-সহায় এই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সর্বমানবীয় পুরাণগুলিতে অবশ্যই বিপরীত বিপদ আছে। যুক্তিবিচার যেখানে কম বিকশিত, সে অসভ্য আদিম সমাজে পুরাণ মানুষকে অনেক সময় পুরাণহীন বানরের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে। সভ্য সমাজেও তা করে তোলে, যার ফলে জাতিতে জাতিতে নৃশংস দ্বন্দ্ব। যদি কোন পুরাণ অন্যান্য নৈতিক সামাজিক বা আন্তর্জাতিক পুরাণের বিপক্ষে না যায়, তাহলে আমরা তাকে হয়তো বলি ধর্ম কিংবা আদর্শ লীগ্ অব্ নেশনস্। এ সব পুরাণে বিশ্বাস অল্প বিস্তর সবাই করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস তাকেই বলে, যে বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আচরণকে চালিত করে। এ পূর্ণ বিশ্বাস দুর্লভ। যাদের এ আছে, তাদের কেউ ঈশ্বরের দূত ব'লে বা লেনিন ব'লে পূজা পায়, কাউকে পাঠানো হয় উন্মাদ-আশ্রমে। ভগ্নাংশ থাকলে এ বিশ্বাসের জোরে, কেউ হয় ট্রট্স্কি, কেউ পিএর ভিদাল, কেউ শেলি, কেউ ডন্ জুয়ান্। সেইজন্যই কোল্‌রিজের মতে অত প্রয়োজন শুভবুদ্ধির, যে বুদ্ধি দেয় সামঞ্জস্য। We receive but what we give, তার বেশি চাইলেই ঘটে অসাধারণত্ব—প্রতিভা বা উন্মত্ততা। এই পুরাণ সৃষ্টিতে কাব্যের স্থান ব্যাপক ও উচ্চে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুরাণের সঙ্গে কাব্যের :পুরাণের প্রধান তফাৎ হচ্ছে যে শেষোক্তের মধ্যে প্রথমের অবশ্যস্বীকার্য দাবী নেই। নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে আমরা বিপদসঙ্কুল সাগরে ও জনহীন দূর দেশে নাও যেতে পারি, কিন্তু মোটর কারের সামনে থেকে

না সরলে হাসপাতালে যেতে হয়। যাঁরা রিচার্ডসের অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিকমন্যতায় বিরক্ত হতেন, এবারে তাঁরা খুশি হবেন। ব্র্যাডলির কথা তুলে জ্ঞানী রিচার্ডস্ এবার বলেছেন যে কোল্‌রিজীয় ঈশ্বরের মতো বিজ্ঞানও পুরাণজীবী ও ব্যবহারী। কেন, সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য রিচার্ডসে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় Capital পুস্তকে।

যা হোক, কোল্‌রিজের সঙ্গে সেণ্ট টমাসের মিল দেখানো এখানে অসম্ভব। তাছাড়া তফাৎই বেশি। সেণ্ট টমাসের বিপুল সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞান ও খর বুদ্ধির সম্পূর্ণতার অভাবের জন্যেই কোল্‌রিজ থেকে রিচার্ডস্ তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিকশিত করতে পারেন। তাছাড়া টমাস স্পষ্টত কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেন নি। এমন কি মারিত্যাঁ Art and Scholasticism লেখবার আগে আমরা জানতুম না যে এ ভগবদ্বাদী দর্শনে কাব্যাদির কোনো স্থান আছে। কিন্তু ডমিনিকান্‌ব্রতী গিল্‌বি তাঁর আদিগুরুর বিপুল দর্শন থেকে কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে পেরেছেন। ন্যায়শিক্ষিত ঘনসন্নিবদ্ধ এই সুলিখিত ছোট বইটি তাই প্রতি পৃষ্ঠায় উক্ত বৃহত্তর দর্শনের সহিত পরিচিতি ধরে নেয়। স্থান-সঙ্কোচে তাঁর দার্শনিক ভাষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য করা কঠিন এবং এক জায়গায় মূলগত প্রভেদ এ কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রণোদিত তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র করেছে—সে হচ্ছে ঈশ্বরেই সব জ্ঞানের, সব আচরণের পূর্ণতা। তা না হলে এ তত্ত্বালোচনায় মধ্যে মধ্যে চিন্তনীয় ও গ্রাহ্য কথা পেয়েই দ্বিধায় ক্ষান্ত হতে হত না। প্রথমত বইএর আরম্ভ ধরা যাক্, জ্ঞান যে শুধু আধিপ্রত্যয়—Conceptual নয়, প্রত্যক্ষও হয়, এবং সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানবের পক্ষে প্রেয় ও গভীরতর জ্ঞান, এই ধরে গিল্‌বির সূত্রপাত। কারণ শুদ্ধ প্রত্যয় নয়, অনবিচ্ছিন্ন বিশেষের প্রতি মানবমনের গভীর প্রেম, এই প্রেমই ঈশ্বরের দিকে টমাসকে নিয়েছিল। এরই জন্যে ঈশ্বরে বিশেষের চরম বিশেষত্ব। কাব্য এই অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পরিচয়—অপেক্ষাকৃত, কারণ মানুষের মনের গঠনে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় শুধু ঈশ্বরেরই

ও ঈশ্বরেই! কোল্‌রিজের মতাবলীর সঙ্গে এ মতের সম্বন্ধ নির্ণয় স্থগিত রেখে প্রত্যক্ষানুভূতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে একালের বৈজ্ঞানিকরাও বাগ্‌-বহুল সেকথা এখানে মনে রাখা ভালো। কোল্‌রিজ হয়তো এবং গিল্‌বি স্পষ্টই আগামী ব্যঙ্গের উত্তর দিয়ে গেছেন। টমাসের দর্শনে অপরা-বুদ্ধির বা প্রত্যয়গত জ্ঞানের কারবার অবচ্ছিন্ন সার্বিক নিয়ে—সেখানে ইন্দ্রধনু দেখলে তার ব্যাস-দৈর্ঘের মাপ করতে হয় কিন্তু কবির যে বিশেষ ইন্দ্রধনু তার সত্তা ও তার জ্ঞান সেই বিশেষ ইন্দ্রধনুত্বেই। সেখানে মাপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ টমাসের মতে ফর্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়, প্রত্যয়জ্ঞানের কারবার।

বলা দরকার যে টমাসকে বুদ্ধি-বিদ্বেষী ভাবলে ভুল হবে। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়বুদ্ধির তিনি পূর্বাপরমধ্য সম্বন্ধ রেখেছেন। তাই এ তত্ত্বকে thingism তথা ব্যক্তিসর্বস্ব বলে ঝেড়ে ফেলা যায় না। টমাসের কাছে মন প্রাকৃত বিশ্বের অংশ, শরীর। এবং এই মনেরই এক প্রক্রিয়ায় কোল্‌রিজিয়ান সুরে বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও বস্তু এক হয়ে ওঠে। অবশ্য এই অখণ্ডমিলন পদার্থিক নয়, চৈতন্যগত। ছবি যে দেখি, তাতে কয়েকটি রেখার যোগফল আমরা দেখি না, দেখি একটা সমগ্র ছবি। তেমনি মন দিয়ে দেখি না, বা অক্ষিতারা দিয়ে, দেখি সমস্ত ব্যক্তি দিয়ে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানের সমর্থনে গিল্‌বি দুটো ছবি এঁকেছেন। সে ছবি দুটিতে চারটি ক'রে রেখার মধ্যে একটিতে শুধু তফাৎ, কিন্তু সমগ্র ছবি দুটি হল ভিন্ন। স্টর্লিং-কৃত উপায়ে স্নায়ু-সম্পর্কহীন করে হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সে হৃদয় শুধু একটি মাংসপিণ্ড যন্ত্র। যা হোক, এই সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের প্রেমালাপের বাহন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সকলের জ্ঞানরাজ্যে সমান মর্যাদা নেই। এসব মানসিক ক্রিয়াদি কিন্তু চেতনারই কোলে। চেতনার বর্ণনা টমাস করেছেন। তার শুধু এক অংশ হচ্ছে স্মৃতি। চেতনার পরিচয় দিয়ে গিল্‌বি ভগবৎ-করুণার তুলনায় কাব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আবে ব্রেমঁর প্রার্থনা ও:কাব্য তাকে প্রামাণ্য

দিয়েছে। বইয়ের বাকি অর্ধেকে মোটামুটি এই জ্ঞানতত্ত্বের কাব্যে আরোপ। কোনো বিশেষ কবিতা তাতে আলোচিত হয় নি, পূর্বোক্ত কথাগুলি অল্পবিস্তর কাব্যার্থে বিশ্লিষ্ট, ব্যাখ্যাত, বিস্তৃত হয়েছে। তার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কাব্য পরমার্থজ্ঞানেরই জাতের প্রক্রিয়া, তবে বাধ্যতই নিচু দরের এবং একটু অসম্পূর্ণ। রিচার্ড্‌স্‌ অবশ্য কাব্যের পারমার্থিক গোত্র মানেন কিন্তু পরমার্থ মানেন না। মার্ক্সের সঙ্গে দেখছি ম্যাথু আর্ণল্ড্‌ এখনও আমাদের সমসাময়িক। রিচার্ড্‌স্‌ আজও একলা নয়।

ভারত-পথিক ইংরেজ কবি

১৯৪৪ সালে এলন লুইসের অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে কীড্‌রিখ রিজ লেখেন :

Going forward on detachment in Arakan,
Carrying the usual revolver loaded at the time,
He tripped and fell and the hammer struck a stone.
He died on a Sunday in March at eight o'clock.

শুনেছিলুম লুইস মিলিটারি ইনটেলিজেন্‌সের স্বভাব-বিরোধী কাজে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতেন। কর্নেল সাহেব এদিকে নাছোড়বান্দা। ফলে নাকি লুইস একদিন একটা খদের ধারে দাঁড়ান, বোঝাই রিভলভারটা রগে লাগানো। তারপর তিনি নিচে পড়ে যান, পরে দেখা যায় কপালে গুলির পোড়া দাগ। ছুটিতে কলকাতার দিকে আসা আর হল না। লুইসের স্বদেশবাসী ভর্নন ওঅটকিনস্‌ তাঁর মৃত্যুতে একটি সনেট লেখেন :

He was astonished by the abundance of gold
Light. In the street a beggar stretched her hand
Dying. Then the shudder ran through him. Once he had planned
To outdistance the sun in a chariot. But how might he hold
That instant, those uncurbed horses, and mix with the mould
Her liquid shadow near the lotus and timeless sand ?
A slighter man would have noticed the ripples expand
From the stark regenerate symbol. But to him that cold
Figure was real. Ah yes, he died in the green
Tree. What was it, then, pierced him, keen as a thorn,
And left him articulate, humble, unable to scorn
A single soul found on Earth ? O, had he seen
In a flash, all India laid like Antony's Queen,
Or seen the highest for which alone we are born ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে সব ইংরেজ কবি মারা যান তাঁদের মধ্যে সিড্‌নি কীজ্‌ এবং এলন লুইসের কবিপ্রতিভা অবিসম্বাদী। লুইস আমাদের কাছে অনেক বেশি আপন, কারণ ভারতবর্ষ যে ক'জন ইংরেজ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল কবিত্বের আবেগে, তাঁদের মধ্যে লুইস, শুধু যুদ্ধের সময়ে নয়, গোটা বৃটিশপর্বের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহ। যুদ্ধের সময়ে যাঁরা ভারতীয় দৃশ্যের তাড়না বোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো আর কাব্যচর্চা করেননি, কেউ কেউ অকালে মারাই গেছেন, যেমন ক্লাইভ ব্র্যানসন্‌। কিন্তু যে সব কবিতা আমরা পেয়েছি, পড়েছি, তাতে অনেকের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখি ভারতবর্ষের বর্তমান দৃশ্য এঁদের কতটা নাড়া দিয়েছিল। তাই এঁদের অনেকের কবিতা, অন্তত কিছু কিছু কবিতার পংক্তি মনে থেকে যায়, এমন কি অনেক লেখার হয়তো নিছক কবিত্বগুণ বিশেষ স্মরণীয় না হলেও। মার্টিন কর্কম্যানের ভাষায় বলা যায় ঃ

You say this is not poetry :
You are right :
Upon this page
Is bloodred rage.

রাগ, অবজ্ঞা লজ্জা, দুঃখ, অর্থাৎ এক কথায় মানবিক করুণা বা অনুকম্পা ঃ এঁদের অনেকের মনে জেগেছিল সেই অনুকম্পা যাতে মানুষ মানুষকে একাত্মভাবে ভাবতে চায়; দায়িত্বের অংশীদার নিজেকেও মনে করে; জীবনের বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। ওএনের বিখ্যাত যুদ্ধ ও করুণার কথা তাই মনে পড়ে, যদিও হয়তো এঁরা অনেকেই কবি হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যে নাম লিখে গেলেন না। কিন্তু যুদ্ধের করুণা এ ক্ষেত্রে আবার সাম্রাজ্যের নির্মমতার পাপে দু-তিন শতাব্দীব্যাপী সাক্ষাৎ ও প্রচ্ছন্ন এক দীর্ঘ যুদ্ধের শোষণের পাপে আরেক মৌলিক তীব্রতা পেয়েছিল। তাই জর্জ টেলরের মনে হয়েছিল ঃ

I sit here in my uniform
Ignored because of what has been.

তাই এলন লুইসের রেজিমেণ্ট-সহকর্মী জন টর্নরের মনে হয়েছিল :

O Brother, it is strange that you and I should be so far
divided yet so near

প্রার্থনায় আকুতি জেগেছিল :

O God that I could break this iron shell
And give this dry and thirsty country rain.

একে সাম্রাজ্যের দীর্ঘকালের সিন্দবাদী বোঝা ঘাড়ে চেপে তার উপরে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আর রাজনৈতিক অশান্তি ; সবসুদ্ধ ভারতচিত্র হয়ে উঠেছিল সাধারণ সৎ ইংরেজ সৈনিকের কাছে যেমন করুণ তেমনি পীড়াদায়ক। এদিকে মেলামেশায় পাপক্ষয় প্রায় অসম্ভব। এ ভারতীয় দৃশ্যে নিজেকে সহজে মেলানো যায় নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের চেষ্টায় ; যৎসামান্য সেতুবন্ধের চেষ্টা করা যায়, যাকে বলা যায়, নিম্নশ্রেণীর নিচু জাতের লোকের সঙ্গে, কপাল ভালো হলে দূর থেকে চাষাভুষার সঙ্গে একটা আত্মীয়তাবোধে। এলন লুইসকে কারান্জে গ্রামের মন্দিরের খবর দেয় ছাউনির ধাঙড়, সেই শ্রেণীর লোক যার মৃত্যুতে পল উইডোজ লেখেন :

Monotonous, yes. Degrading, perhaps. But still
He has, for what it's worth, a cast-iron defence,
Who passed his whole God-given existence,
Emptying the faeces of sahibs, until
Death eventually rewarded his diligence.
At least he can claim in Nirvana without pretence
That his life was dedicated to the Fundamental.

তাই প্রথাসিদ্ধ দর্শনীয় বিষয়ে এঁদের জাগে প্রতিক্রিয়ার বিতৃষ্ণা। রেজ লেভির তাজমহল দেখে মনে হয়েছিল মোগল-বৈভবের ঐতিহাসিক ব্যঙ্গ :

Their lifetime's living glory built great halls,
In jewelled state enthroned to sit all-wise
Among the passive people—they who weighed
With agony and tears such graciousness.

রালফ্ ক্রুকের "চাঁদিনী রাতে তাজমহলে"র শেষ লাইনকটি হ'য়ে পড়েঃ

Children lay hungry in their mud-built huts
And war was waging over all the earth,
And rocket bombs fell on the ones we loved :
We came to see the wonder of the world.

তাজমহলের চেয়ে অনেক নিকট আবেদন করে অসহায় মৃত্যু, সাম্রাজ্যের সূর্যাস্তে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু। ডগ্লাস গ্রের ভাষায়ঃ

The outstretched hand
Of mute request
Condemns the soul
Who yet can rest.

এমন কি কাপ্তেনজাতীয় অফিসর-ব্যক্তিদেরও হৃদয়বত্তা আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় দৃশ্যের প্রবল আবেদনে। রনালড গিব্সন লেখেন "পুলিস রিপোর্ট"-এ

Reported : One o'clock; Track Eight,
Woman, nearnaked, lying flat, Had been dead five hours.
Lightly she lay as a fallen cone
On the cold stone.

Item : One corpse, weight sixty pounds.
(Why will they trespass in private grounds ?)
Cause of death, hunger.
Back to the chawls here low life eddies
To wait for bodies.

Effects : One hobble-stick, value nil,
(It cannot pay for her funeral).
Guide, witness, mourner,
To one performer.

O ! the level paddy,
The water and the buffalo ;
See, she lies dead, my scarecrow
Guarding the lightgreen paddy.
On the blackstone.

অথবা রালফ করির

Unconsidered bodies
Float down the tide
Of holy rivers ;
Down the Ganges
With hunched shoulders
Past Benares' steps ;
Godavery, Cauvery,
The River Kistna.
Today I found
Under a dam,
Dedicate to Allah,
Blessed by Vishnu;
Serving provinces
With light and water,
A broken body
Stretched across a rock.
Coolies working near
Saw, but ignored it—
Nobody wanted it
Even for record.

ভারতবর্ষের মানুষ করি সাহেবের মনকে টানে, চোখকে মুগ্ধ করে :

Wearing their single garment with an air
Of swaying gracefulness I once thought dead.

অবশ্য এঁদের অনেকের বিকাশের আর কিছু খবর আমাদের জানা নেই ; অনেকের হয়তো ভারতীয় অভিজ্ঞতারও আর কিছু পরিণতি হয়নি। তবে কারো কারো মনের গভীরতর সংবাদ পাওয়া যায়। আরাকানে অকালে মৃত ক্লাইভ ব্র্যানসনের কবিতায় না হোক পত্রাবলীতে এই ভারতীয় দর্শন আশ্চর্য বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে উজ্জ্বল। মার্কসবাদের সাহায্যে যে সুবিধা অর্থাৎ জীবন বা ইতিহাস বোঝার ব্যাপারে যে সাহায্য পাওয়া যায়, ব্র্যানসন সে তত্ত্বের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এবং অসুবিধাটুকু. অর্থাৎ বেশি দ্রুত বেশি সহজে সমস্যাটা

ধরে ফেলার ব্যাপারটা তাঁর প্রকৃত শিল্পী-স্বভাব পরিহার করেছিল। তবু কেন ব্র্যানসন কবিতায়, যেখানে কিছুই আর মনের অগোচর থাকে না সেই রচনার লোকে তেমন সিদ্ধিলাভ করেন নি? তার কারণ বোধ হয় এই যে, ব্র্যানসন মুখ্যত চিত্রকর ছিলেন, কবিতা তাঁর দ্বিতীয় কর্মবৃত্তি। অবশ্য কডওএলের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাঁর অসামান্য গদ্য তাঁর পদ্যের গতানুগতিকতা—ইংরেজি কাব্যের ঐতিহ্যের চাপেই বোধ হয়—অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে। ব্র্যানসনের চিঠিতে প্রকাশিত তাঁর শিল্পীসত্তা যা তাঁর মার্কসবাদে শিক্ষিত মনকে ভারতীয় যন্ত্রণার ও করুণার পথে সংক্ষেপের সুযোগ দেয় নি। শিল্পীর সততায় সংক্ষেপের সুযোগ কম, যেমন ধরা যাক্ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী লেখক সমরসেট্ মমের লেখায়। মমের ক্ষেত্রে ব্র্যানসনের মতো বুদ্ধি বা বিশ্বাসঘটিত কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না, বেলগ্রেভিয়ার মানুষ তিনি, তবু তো এই বিখ্যাত প্রবীণ ও বিত্তবান ইংরেজ লেখকের ভারত ভ্রমণের শেষ হয় এইভাবে :

"ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময়ে লোকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কোন দৃশ্য আমাকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছে। আমিও প্রত্যাশিতভাবেই উত্তর দিলুম। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল তাজমহল নয়, বারাণসীর ঘাট নয়, মাদুরার মন্দির বা ত্রিবাঙ্কুরের পর্বতমালা নয়; আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল চাষী; ভীষণভাবে জীর্ণ-শীর্ণ; তার নগ্নতা ঢাকবার জন্য শুধু এক টুকরা কানি তার নিজের চষা রৌদ্রদগ্ধ মাটির রঙ তার ঘর্মাক্ত শরীরের মধ্যভাগে জড়ানো, ভোরে হিমে কম্পমান, দুপুরের তাপে ঘর্মাক্ত চাষী, শুকনো ক্ষেতের উপরে যখন সূর্য লাল হয়ে অস্ত যায় তখনও যার ছুটি নেই, উপবাসী চাষী যে অবিশ্রাম খাটে, উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে সারা ভারতের বিরাট ভূখণ্ড ব্যেপে যে কেবল খেটে চলেছে, যেমন তার বাপ খাটত তেমনি বংশের পর বংশ খেটে চলেছে তিন হাজার বছর ধরে সেই যখন আর্য আগন্তুকেরা এদেশে হানা দিলে সেই কাল থেকে খেটে

চলেছে সামান্য এক মুঠো খাদ্যের জন্য, যার একমাত্র আশা কোনো মতে বেঁচে থাকা। এই দৃশ্যই ভারতবর্ষে আমার কাছে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী লেগেছে।

ওএলিংটন নাকি বলেছিলেন যে ওঅটরলু-র যুদ্ধ জেতা হয়েছিল ইটনের খেলার মাঠে। মনে হয় ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা বলবেন যে, ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে গেল ইংলণ্ডের যত পাব্লিক স্কুলে।”

শিল্পী বা সাহিত্যিক যদি সততায় সজাগ হন, তাঁর চোখ-কান-মন খোলা রাখাটাই যদি তাঁর শিল্পকর্মের অভ্যাস করতে পারেন, তাহলে ভারতে এলে সে অভিজ্ঞতার প্রচণ্ডতা তাঁকে নাড়া দেবেই এবং ভারতীয় দৃশ্যের স্বরূপ তাঁর মননে, অন্তত চৈতন্যের আভাসে ইঙ্গিতে ধরা পড়বেই। গত যুদ্ধের ইংরেজ কবিদের মধ্যে এলন লুইসের কাব্য-প্রতিভা ও মনন তাই ভারতে এসে তীব্রতায় কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। দুঃখের বিষয়, এই গভীরতা সংহতির কৈলাসকেন্দ্রে পৌঁছবার আগেই আরাকানে অকালে তার পূর্ণচ্ছেদ হয়। লুইসের ইচ্ছা ছিল কলকাতায় ছুটিতে আসার, বাংলা শিল্পসাহিত্যের সমাজে আলাপ পরিচয় করার।

লুইসের দ্বিতীয় এবং ভারতীয় কবিতার বই Ha ! Ha ! Among the Trumpets-এর ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যাত কবি ও সমালোচক রবার্ট গ্রেভস্। উৎকৃষ্ট ভূমিকা এবং কিছুকাল আগে দেখলুম বৃদ্ধ অগ্রজ তাঁর ক্লার্ক বক্তৃতাবলীতে অনুজ লুইসকে একজন প্রধান কবি বলেছেন। গ্রেভসের ভাষায় আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কারণ আমার একটা আশঙ্কা ছিল যে, হয়তো আমার ভারতীয়পণার মমত্বে এলন লুইসের কবিত্বে এতটা অভিভূত হয়েছি। গ্রেভসের মতো সুদূর ও কঠিন কবি-সমালোচকের সমর্থনে তাই লুইসের ভারতচিত্রের মূল্য যে তাঁর ইংরেজি কবি-বিকাশেরই সার্থকতার সমার্থক তা প্রমাণিত হ'ল।

লুইসের ভারতজিজ্ঞাসা সততানুসারে স্বভাবতই তার ব্যথাময় উদ্‌-ভ্রান্তিতে আরম্ভ। সেই সময়ে তিনি ফৌজী আইন এড়িয়ে নিউ স্টেটস্‌ম্যান পত্রে লিখেছিলেন তাঁর প্রতিবাদ ঃ “আমরা এদের দিয়েছি

রুটি নয়, পাথর।" সেই পাথরের ব্যথার আবর্তে তাঁর মন সমানেই কাতর হয়েছিল। তাঁর চিঠিতে, কবিতায়, কম্‌লা‹নের গল্পে এই সুরটিই সবচেয়ে তীব্র। অবশ্য ব্রানসনের মতো কার্যকারণের জ্ঞানে তাঁর যন্ত্রণার দিগদর্শন আসেনি সহজে। তাই ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রের শত্রুর কথা ভেবে লুইসের মনে হয় ঃ

And though the State has enemies we know
The greater enmity within ourselves.

যদিচ আমরা

Kept from the dew and rust of Time.
Instinctive truths and elemental love.

আর তার পরে স্বভাবতই মনে হয় ঃ

Only aloneness, swinging slowly Down the cold orbit of an older world
Than any they predicted in the schools
Stirs the cold forest with a starry wind,
And sudden as the flashing of a sword
The dream exalts the bowed and golden head
And time is swept with a great turbulence,
The old temptation to remould the world.

নৈঃসঙ্গ্যের এ সান্ত্বনায় কিন্তু মানুষ নিয়েই হয় মুস্কিল। বাঘের থাবা বা পাইড্‌ পএন্ড্‌ মাছরাঙার ইনস্টিংকটিভ রাইটনেস্‌ এই মেজাজে অনেক আপন লাগে। তবু তো লুইসের ভারতপথিক কবিমন আসন্ন অভিজ্ঞতার মর্যাদায় যাত্রার আরম্ভেই নিবিষ্ট হয়েছিল।

তারপরে বোম্বাই, ১৯৪২ সালের বোম্বাই, মারাঠা পাহাড়, কারাঞ্জে গ্রামের দেবমন্দির, সত্তার প্রতীক দেবমূর্তির আহ্বান, এদিকে অপরিসীম দারিদ্র্য আর বিরূপতার ছবি ঃ

But the people are hard and hungry and have no love,
Diverse and alien, uncertain in their hate,
Hard stones flung out of creation's silent matrix,
And the Gods must wait.

এমনকি ভারতবর্ষের ক্লান্ত শুকনো মাটিও লুইসকে অস্থির করে গ্লানিতে। এদিকে লুইসের মনে হয় তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, সব দিক থেকেই ভারতীয় জগতে বহিরাগত : "ভারতীয় সাহিত্য আমার প্রায় অজানা, বেদ-উপনিষদের এভরিম্যান• অনুবাদ, টাগোর আর আনন্দ্‌ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য আমার পড়া নেই। ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বও পাইনি। আমার সবচেয়ে সহজ যোগাযোগ আর স্বাস্থ্যের ও কাব্যের সবচেয়ে স্বাভাবিক উৎস হচ্ছে ভারতীয় চাষী …দুর্ভিক্ষে অনাহত এ অঞ্চলে মনে হয় চাষীই যা কিছু "সভ্য" ভারত হারিয়েছে, তার জিম্মাদার।" এই প্রসঙ্গেই লুইস লেখেন আর্চরকে : "কিন্তু কি আনকোরা ঐশ্বর্য ভারতীয় লেখকদের হাতে রয়েছে—শুধু যদি মনের আবহাওয়াটা বিষয়-বস্তুর স্বাধীন ও গভীর বিকাশের পক্ষে আরো অনুকূল হত! এখানে কি যেন কোথায় বিগড়ে গিয়েছে আর সব কিছুই হয়ে পড়েছে দূষিত।" এই সূত্রেই লুইসের সাহিত্যজিজ্ঞাসা জাগে : "তোমার কি মনে হয় না যে ভারত এখন যে অবস্থায় পৌঁছেছে সেখানে "পদ্ম" ব্যাপারটা ইওরোপের গোলাপের মতোই (মালার্মের মতবাদ) মিথ্যা হয়ে গেছে? আর এখন চাই প্রখর স্বেদাক্ত বাস্তবতা, তা সে কি গ্রামে কি শহরে? কেন বলো তো এই বাস্তবতা আয়ত্তে আনা এত কঠিন? প্রতিদিন সূর্য তো এরই শিক্ষা দিচ্ছে।"

রেজিমেণ্ট সঙ্গী জন টর্নরের ভিন্ন মনেও প্রশ্ন প্রকাশ পেয়েছিল ধর্মপ্রাণ আরেক ভাষায় :

> So we must know the land,
> Know the lie of the land
> The lie of the soil
> The lie of the soul.

সত্তার প্রশ্নে, প্রেমের পরম মূল্যে জড়িয়ে যায় এই জিজ্ঞাসা। সত্তাবাদের মরমী কবি রিলকের কথা লুইসের মনে হয় :

"রিলকে যদি জানতে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চেয়েছি

তাহলে হয়তো তুমি আমাকে বলতে :
মানবসমাজ বেছে নেয় তার বরপুত্রদের, যাদের কাছে সে সঁপে দেয়
হয়তো বা কানাকড়ি, কিংবা জহর, নিদেন একটা বোধ
যাতে জানা যায় কার বিকাশ সম্ভব আর কিইবা সর্বদা স'য়ে যেতে হয়
আর সে কি উত্তর যা জীবিতেরা দিতে পারে মৃতদের।

এ সব মানুষদের মুখ দেখে চেনা যায় ;
অন্তত নজরে পড়ে তাদের অনুপস্থিতি ;
তাদের কখনো ঘটে না সুযোগ বা উপলক্ষ্যের অভাব,
তারা নির্বিষ্ট স্বভাব।"

আমাকে খুঁজতে হয় উপলক্ষ্য।
আর পরিশ্রম অবসাদ দৌরাত্ম্য বাধায় .
জলস্থলব্যাপী চাকচিক্য, আত্মপ্রচারের ঘটা যত কিছু
এই হিংস্র প্রতিযোগী দিনকাল দাবি করে।

তবু মাঝে মাঝে, খুঁজে ফিরে প্রহরেরা অন্তরে নামায় ডানা,
কোমল এন্টিনা জোড়া পেতে রাখে আমার হৃদয়ে,
আর আমি ভুলে যাই সহস্র যোজন অভিযান
যেন বা এবারে সৃষ্টি শুরু হল প্রথম বিস্ময়ে।

তাকিয়ে দেখেছি আমি কোথা শুচি দিগন্তের কোণে
পৃথিবী উঠছে ঐ ধূসর বিরিক্ত শিখরে শিখরে
যেন ধরে ভাঁজে ভাঁজে ঝুরু ঝুরু শূন্য মাটি হাতের আড়ালে
অথবা যেমন শিশু রঙীন জিনিস ধরে ছোটো ছোটো মুঠির ভিতরে
পরম খুশিতে : আমি জানি অজানিত দেশ ঐ দুই পা বাড়ালে
নিকটেই এবং বাস্তব, যেন সদ্য প্রসবের ক্ষণে।

তারপরে হল রোগ আর অস্থিরতা।

জ্বরের প্রদাহে আর ঘামে সারা সপ্তাহটা জ্বেলে
প্রবল তৃষ্ণায় চাই নিস্তব্ধতা তুমি যা অর্জন করেছিলে,

আর জানো তোমাকেই ঈর্ষা করি, যেন বা সে উপহার
জন্মদিনে সৌভাগ্যবান যা পেয়ে যায়।
তখন ভেবেছি আমি তৎ যা সৎ তা না খুঁজেই মেলে।

সমুদ্র এখন দূর, মালবাহী ভাড়াটে স্টীমার
আরেক সমুদ্রে অন্য আরোহীর দল নিয়ে যায়।

তাঁবুর ভিতরে আমি বসে আছি ভারতবর্ষের
আঁধারের মাঝে, আর লণ্ঠনের আলো কাঁপে দমকা হাওয়ায়।

শৃগালেরা ফেউ ধরে আর আর্তনাদ করে নালায় নালায়,
খড়পাতা মাটিয় শয্যায় স্থির ঘুমায় রাখাল,
আর আমি বুঝি বেশ কোনো কিছু আসে যায় নাকো
কোথায় কে থাকে কার ভাগ্যে কিবা ঘটবে যে কাল।

এদিকে বিষ্ণুর মূর্তি, গ্রামীন শিল্পীর গড়া নিষ্ঠার নির্দেশে,
প'ড়ে আছে এক গাদা পাথরের পাশে, নির্বিকার
শুধু চায় সরলতা যেটা 'সে' ও আমি ভালোবেসে
খুঁজে পেয়েছিলাম, যা বুঝতে তুমিই বেশ ভালো
চূড়ান্ত চরম সেই পাওয়া, রিলকে, কিন্তু আহা একী দূর দেশে।

ভারতীয় অভিজ্ঞতার যন্ত্রণার মধ্যে লুইসের কবিসততা এবং প্রেম, তাঁর স্ত্রীর প্রবাসী স্মৃতি লুইসকে মননের কেন্দ্রচ্যুতি থেকে বাঁচায়। ফলে আমাদের হতভাগ্য জীবনের মূল রূপটি লুইসের মনে এবং কাব্যে আস্তে আস্তে ব্যক্তিক পরিগ্রহণের পূর্ণতা পায়। স্টীভন স্পেণ্ডর দু' কথায় লুইসকে বাতিল করেছেন ছেঁদো কথার ব্যাপারী বা facile বলে। এক হিসাবে, অন্তত ভারতীয় পর্বে লুইসের ফ্যাসিলিটিরই অভাব দেখা যায়। অবশ্য এই ভারতীয় অভিজ্ঞতা বুঝতে হলে মনে যে শুধু বুদ্ধি বিনয় থাকা দরকার, তা স্পেণ্ডরের মতো মেসিয়ানিক নাটকীয় ইংরেজের পক্ষে সহজলভ্য নয়। আর দু-চার সপ্তাহ বেড়িয়ে গেলেই

ভারতীয় অভিজ্ঞতা যে আয়ত্তে আসে না, মার্কিন কবি কার্ল শাপিরোর ক্ষেত্রেও তা দেখা গেছে।

ভারতীয় জীবন রূপ ধরে লুইসের মনে এবং কাব্যে উভয়েই, বরঞ্চ বলা যায়, লুইসের কবিস্বভাবের গভীরতা এত সংহত যে, ব্যক্তিগত চিন্তায় চিঠিতে যদি-বা কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে, তা কাব্যে সমগ্রতার রসাভাস পায়। অনেক সময়ে দেখা যায়, শিল্পী বা কবি বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে বোঝেন অনেকটা, কিন্তু তাঁর শিল্প-চৈতন্যের গভীরতর রূপান্তরের বিশ্বে সে-বোঝা নানা কারণে রূপ পরিগ্রহ করে না। লুইসের ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের প্রতিশ্রুতিই মুখ্য, অর্থাৎ ভারতীয় জীবনের বাস্তবতা তাঁর সমগ্র স্বভাবের একাত্মীকরণের ব্যাপার, বহিরঙ্গ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত আবিষ্কার নয়। এর একাত্মীকরণের প্রক্রিয়া স্বকীয় বলেই এর উপলব্ধি মন্থর, ক্রমিক, কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যথিত কিছুটা নৈঃসঙ্গ্য-বোধের উপর নির্ভরশীল।

তাই প্রাকৃতিক সত্যের সরল রেখায় মন নিশ্চিন্ত বোধ করে: "ইস্ আমার কলম থেকে কিরকম বাক্যই না বেরোচ্ছে দেখ। আসলে আমি অনেক সোজা কথা বলতে চাই। কাল নদীর বালিতে বাঘের প্রকাণ্ড থাবার চাপ মাড়ালুম, তাকিয়ে রইলুম, তাজা দৃষ্টিতে, খুশি লাগল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা জীবনের চিহ্ন দেখে। মনে হল— কালিতে গভীর ঐ ছাপগুলি যদি উঠে আসে আর একটি থাপ্পড়ে আমায় নীরব করে দেয়—বাঃ—এবং অনেকদিন বাদে প্রথম একটা স্বতস্ফূর্ত চমক পেলুম কাব্যিক আবেগের এবং কাব্যিক পুরুষার্থের। কাব্য তো প্রেমের মতো, আর সৈনিকত্ব একটা বন্ধ্যা ব্যাপার।"

কারণ দেশের মানুষের সমাজে বিদেশী সৈনিকের বাধা অনেক:

"ভাষার বা লোকেদের রীতিনীতির জ্ঞান আমার এতই কম যে, আমি শুধু মাত্র শ্রদ্ধানম্র বিদেশী হিসাবে বিনীত চুপচাপ থাকতে পারি। এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বেজায় ক্লান্তিকর। আমার যদি সময় আর অনুশীলন থাকত, তবে সেতুবন্ধের চেষ্টা করতুম। কাল একটা আরণ্যক

নদীর উপরে নড়বড়ে দেশী সাঁকো পার হলুম, পায়ে ছিল একরকম সুকুমার অনুভব, সেটা সাঁকোর নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ নয়, বরং সেটা গ্রাম্যজীবনের ধরণধারণের বিষয়ে একটা বোধ। এবং প্রাচীন ও অপূর্ব-সংকল্পিত এই জীবনযাত্রার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার থেকেই আমার কবিতা আজ-কাল এত দ্বিধান্বিত হয়। কয়েকটি কবিতা আপনাকে পাঠাচ্ছি, অনুরোধ এই এই কোণ থেকে আমার বিচার করবেন।

লুইসের ভারতীয় কবিতার মিতবাক্ করুণায় হার্ডির কথা মনে পড়ে, সহানুভূতির এই দ্বিধা-বিনম্র স্বচ্ছ দৃষ্টি ক্লাইভ ব্রানসনকে খুশি করত। ভারতবর্ষে রাত্রির অন্ধকারে ইওরোপীয় অতীতও লুইসের কাছে ব্যাপক-তর বিন্যাসের ফোকস্ পায়ঃ

এখানে মাইনজাল নেই বিদীর্ণ গহ্বর
কাঁটাতারে ছিন্নভিন্ন পশ্চিমের নিসর্গের মতো
এ প্রাচ্যের প্রাকৃতিক আরণ্যকদেশে
মানবিক যুদ্ধ অপসৃত।

এখানে তিনটি ভাগ অন্ধকার কুর্নিস জানায়
যেদিকে সিকির ভাগ জ্বলে সদা আলোক উৎসবে,
জীর্ণশীর্ণ গ্রামগুলি মুখ তোলে আর মৃদু হাসে
দিনে দিনে বাড়ে চাঁদ কুমারসম্ভবে।

আমি সারা পৃথিবীকে পুড়িয়েছি প্রদাহে নির্বোধ,
ভূমিসাৎ করেছি তো সমুচ্চ স্বর্লোক,
প্রতিটি সহজ কাজে মিশিয়েছি লজ্জিতের ক্লেদ,
নিজের আবেগ ব'লে কিছু ছিল নাকো দুঃখ সুখ।

ডুবেছি খেদের স্পন্দে জোয়ার-ভাঁটায়
সাগররাজের বালুশয্যায় অতলে
প্রত্যয়হীনের উপসাগরের লজ্জিত ধারায়
আসঙ্গ করেছি লাভ মৃতদের রক্তদন্ত কন্যাদের দলে,

যতদিনে তুমিই না দীর্ঘশ্বাসে জাগালে আমায়
আমার মাথার রুদ্ধ অন্ধকারে ছড়ালে আরাম,
গান করে গেলে আর থামলে না, যবে শেষটায়
তোমার হৃদয়ে আমি নৈবেদ্যের প্রসাদ পেলাম।

আমরা দিয়েছি ফেলে মরণকে তিক্ত দুর্বিষহ
যার দুই হাতে বাঁধা জীবনের ক্ষীণকটি কায়,
এবং একটি শ্বাসে করেছি সংগ্রহ
যা কিছুর আদি অন্তে পুরুষ-ও-জায়া।

তাই তো যদিও ভ্রান্তি বেড়ে চলে যন্ত্রণার ভারে
এবং যৌবন প'ড়ে থাকে লাস্ তোরণের পাশে
এবং সুন্দর বহু দেহ শক্ত হ'য়ে ওঠে মাটির তুষারে
এবং প্রাচীন নিষ্ঠা থেকে নবতর ঘৃণা আসে,

তবুও সময় থাকে পূর্বাকাশে অচল অটল
দীঘিতে চাঁদের আলো স্থির থাকে আর মানুষের
যন্ত্রণা আরাম আনে নীড়ে শুষ্ক ঠোঁটে
এবং তোমার শান্ত শুভ্র মুখ আমি দেখি ফের।

বিচিত্র কম্পন জাগে পশুর হৃদয়ে
কত অজানিত বিশ্বে মৃত্যুতে সে লোটে ;
তোমার হাতের মধ্যে, তোমার শান্তিতে আমি রই,
আর দেখি এই শেষ জ্যোতির্ময় বিশ্ব জেগে ওঠে॥

আমাদের দুর্ভাগ্য যে লুইসের বিকাশ সম্ভাবনার পর্বেই শেষ হয়ে গেল। ১৯৪৪-এর মার্চে মৃত্যুর সংবাদ বেরোল; গ্রেভস বলেছেন: পুরানো কাগজ দেখো, কোথাও পাবে না এই প্রাথমিক ঘোষণাটুকু: এলন লুইস মহান কবিতা লিখেছেন। গ্রেভসের মতে লুইসের শক্তি নিহিত ছিল লুইসের কাব্যিক সত্তায়। বিয়াল্লিশে ভারত যাত্রা এই

সততার পরিণতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ গ্রেভসের ভাষায় ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, যেখানে সুসময়েও প্রেমের পরীক্ষা হয় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে। এবং লুইস আসেন ভারতের দুঃসময়ে। যদিও স্বভাবের সততা তিনি রক্ষা করলেন, যন্ত্রণাভোগ করতে হল বেশ: My insides are haggard। গ্রেভসকে লুইস লেখেন: ভারতের তুলনায় ইংল্যাণ্ড তো 'সহজ'—Easier to corrupt, and easier to improve.

নিজের কাব্যসাধনার অসম্পূর্ণতার বোধ নিয়েই লুইস জীবনান্ত করলেন, কিন্তু সেই ক্ষোভের মর্মে রইল একটা বলিষ্ঠতা।

I can't reach it—do you see how a poem is made or fails? By perpetual trying, by closer pointing, by seeking and not finding and still seeking, by a robustness in the core of sadness.

ক্ষোভের মর্মস্থলে, বিষাদের অন্তস্তলে এই যে অপরাজেয় মন, যার বলে অন্বেষণ হার মানে না, ভারতবর্ষে তার কথা এই কবি বলতে পেরেছেন। লুইস তাই আমাদের আত্মীয়, ইংরেজি কাব্যে আমাদের দরদী শহীদ।

ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড

রবীন্দ্রনাথ খুশিতে হেসে বলেছিলেন, এজ্‌রা পাউণ্ড, সে আমার ভারি ভক্ত ছিল, একেবারে পাগল, প্রায়ই আসত, সোফায় বসত না, পায়ের কাছে বসত, লিখেও ছিল আমার বিষয়ে।

কল্পনা করা যায়, লণ্ডনের বাসায় একান্ন বছরের প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ, পায়ের কাছে মাঝপশ্চিমা আমেরিকান উদ্দাম কবি ছাব্বিশ বছরের এজরা। সরোজিনী নাইডুর গল্প মনে পড়ে, হায়দ্রাবাদে নিজামপ্রাসাদে সন্ধ্যা ছটায় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, পায়ের কাছে ফরাসী-শিক্ষিত তুর্কী সুলতান কন্যা নিজামের পুত্রবধূ কবির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থেকে থেকে বলছেন, ইউ আর বিউতিফুল। কয়েকবার একথা শোনার পর পশ্চিম-গামী সূর্যের দিকে ধ্যানমগ্ন কবি মুখ নামিয়ে বললেন, ইউ টু আর বিউটিফুল !

এজ্‌রা পাউণ্ড অবশ্য তাঁর প্রথম উচ্ছ্বাস অচিরেই কাটিয়ে ওঠেন, যেমন ওঠেন উইলিঅম বট্‌লর ইএটস্‌। কারণ প্রায় একই। রবীন্দ্র-নাথের ইংরেজি রচনায় ক্রমেই ভাবের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক পড়ছিল ; বাঙলায় তাঁর যে অসামান্য কবিপ্রতিভা বিচিত্ররূপে নানা কবিতায় কাব্যশরীর পায়, সেই কাব্যশরীর এইসব ইংরেজি ভাবানুবাদে বড়োই অশরীরী হয়ে ওঠে। ইংরেজ পাঠকরা তাই অল্প-কালের মধ্যেই পুনর্বিচার করতে আরম্ভ করেন। পাউণ্ডের ১৯১২-এর ভক্তি শীঘ্রই ঔদাসীন্যে দাঁড়ায়। তবু বলতে হবে ইএট্‌সের ঘোর অবজ্ঞার রেশ বোধ হয় পাউণ্ডে পাওয়া যায় না। ১৯১২ সালে পাউণ্ড হ্যারিএট মনরোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান, লেখেন ভেরি গ্রেট বেঙ্গলি পোএট, রবীন্দ্রনাথ টাগোর, অনুবাদকে বলেন ভেরি বিউটিফুল ইংলিশ প্রোস্‌, উইথ মাস্টারি অফ কেডেন্স।

১৯১৩ সালের জানুআরিতেই পাউণ্ড চক্ষুষ্মান বা সাবালক হয়ে উঠেছেন। তখন রাজা পঞ্চম জর্জের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিরকমভাবে গান লেখেন, ভারতীয় ছাত্র কর্তৃক তার কাহিনী পাউণ্ড মহাকৌতুকে স্বকীয় পিতৃদেবকে লিখছেন। এপ্রিল মাসের চিঠিতে পাউণ্ড কয়েকটি কথা লেখেন, যার সমালোচনা মূল্য অনেক বিস্তৃত প্রবন্ধের চেয়ে বেশি। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় এমনি একটি প্রবন্ধ পড়বার সৌভাগ্য হল, তাতে পণ্ডিতপ্রবর শিবনারায়ণ রায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিচার চেষ্টায় যে অন্যায় করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। শুধু আমাদের অনেক সময়ে অসতর্কতার বশে কি রকম ভুল হয়, তার একটি উদাহরণ দিই। শিবনারায়ণবাবু ভুলে গেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে জর্মান সুরকারদের তুলনাই হয় না, কারণ তাঁরা কথা ও সুরে অর্ধনারীশ্বর রবীন্দ্র-গীতির রচয়িতা নন। পাউণ্ডের এই সমালোচনাটুকু তার স্বকীয়তার জন্য মূল ইংরেজিতেই উধৃত করি:

God knows I didn't ask for the job of correcting Tagore. He asked me to. Also it will be very difficult for his defenders in London if he takes to printing anything except his best work. As a religious teacher he is superfluous. We' ve got Lao Tse. And his (Tagore's) philosophy hasn't much in it for a man who has 'felt the pangs' or been pestered with Western civilisation. I don't mean quite that, but he isn't either Villon or Leopardi, and the modern demands just a dash of their insight. So long as he sticks to poetry he can be defended on stylistic grounds against those who disagree with his content. And there's no use his repeating the Vedas and other stuff that has been translated. In his original Bengali he has the novelty of rime and rhythm and of expression, but in a prose translation it is just mere theosophy', small of course if he wants to set a lower level than that which I am trying to set in my translations from Kabir, I can't help it. It's his own affair.

১৯১৭ সালে পাউণ্ড লেখেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার রহস্য বিষয়ে একটি মজার চিঠি। এলেক এরেনসনের "পশ্চিমার

চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" বই যাঁদের পড়া তাঁরা অবশ্য এই রহস্যের কাহিনী জানেন।

Tagore got the Nobel Prize because, after the cleverest boom of our day, after the fiat of the omnipotent literate of distinction, he lapsed into religion and optimism and was boomed by the pious non-conformists. Also because it get the Swedish Academy out of the difficulty of deciding between European writers whose claims appeared to conflict. (Sic.) Hardy or Henry James ?

Tagore obviously was unique in the known modern Orient. And then, the right people suggested him. And Sweden is Sweden. It was also a damn good smack for the British Academic Committee, who had turned down Tagore (on account of his biscuit complextion) and who elected in his stead to their August corpse, Alice Meynell and Dean Inge.

Therefore his Nobel Prize gave pleasure unto the elect.

১৯৩৯ সালের এক চিঠিতে পাউণ্ডের উদ্‌গার পাওয়া যায় ভারতবর্ষ বিষয়ে, তার শেষে আসে এই বাক্যটি Rabi himself poifickly hopeless re statal sense etc.

হয়তো বা ভক্তির জালে পড়লে পরে মানুষ এইভাবে নিজেকে বার করবার চেষ্টা করে ; ভাবে, না হলে সে "লায়েক" বা সাবালক হতে পারছে না। কিন্তু ১৯১২-র শেষে পাউণ্ডের প্রবন্ধটি তৎসত্ত্বেও বিস্ময়কর লাগে, তাঁর চোখ কানের প্রখরতার প্রমাণ হিসাবে। তাছাড়া পাউণ্ড বা ইএটসের মতো তীক্ষ্ণধী কবি-সমালোচকদের কথা আমাদের অনেক কিছু বিষয়ে ভাবাতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইংরেজি চেহারায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তির অসম্পূর্ণতা, তাঁর কবিত্ব-শক্তির প্রবলতা এবং তাঁর চারিত্র্য এই অনুবাদে প্রায় চাপা পড়ে আছে, আধ্যাত্মিক আবেদনের বিষয়ে একটা সাময়িক ধারণার জের ইংরেজিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশকে ব্যাহত করে। কর্তৃপক্ষের উচিত রবীন্দ্ররচনার নূতন মানের অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

পাউণ্ডের প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঃাশয়ের কবিতাবলীর প্রকাশ আমার মতে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। জানি না, পাঠকদের একথা বোঝাতে পারব কি না। আমার কথার প্রমাণ অবশ্য কবিতাগুলিই। এ কবিতা পড়তে হবে আস্তে আস্তে, নিস্তব্ধ শান্তিতে চেঁচিয়ে। কারণ এর ইংরেজি অনুবাদ লিখেছেন একজন বিরাট সঙ্গীতকার, একজন ওস্তাদ শিল্পী যাঁর কারবার আমাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার সঙ্গীত নিয়ে।

এক মাস হয়ে গেল, শ্রীযুক্ত ইএট্‌সের ঘরে গিয়ে দেখলুম তাঁকে মহা উত্তেজিত এক মহাকবির আবির্ভাবে, আমাদের সকলের চেয়ে মহত্তর এক কবি।

কোথায় আরম্ভ করব ভাবছি। বাংলাদেশে পাঁচ কোটি লোক। বাইরে থেকে মনে হয় রেলগাড়িতে আর গ্রামোফোনে এ জাতটা বুঝি ডুবেছে। কিন্তু এর তলায় তলায় আছে একটা সংস্কৃতি, যার সঙ্গে তুলনীয় বিংশ শতাব্দীর প্রভঁস্।

ঠাকুরমশায় এদের মহাকবি আর মহাসঙ্গীতকারও বটে। ইনি এদের জাতীয় সঙ্গীত দিয়েছেন. মার্সেএস্ এর সঙ্গে তুলনীয় প্রাচ্য-শোভন গান। তাঁর সোনার বাংলা আমি শুনেছি। তার সুর সম্পূর্ণ প্রাচ্য, কিন্তু অদ্ভুত তার জাদু, ভিড়কে মাতাবার মতো। এ গানটা জাতে সীমাবদ্ধ, ঠুংরী জাতের, ব্যক্তিগত কিন্তু কর্মোদ্দীপনায় পূর্ণ।

প্রসঙ্গত ও কথাটা বললুম। এতে এই প্রমাণ হয় যে, দান্তে-কথিত তিনটি মহাকাব্যের বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে ঃ প্রেম, জাতীয়তা বা যুদ্ধ; আর আত্মিক মাহাত্ম্য।

মধ্যযুগের আরেকটা গুণও লক্ষ্য করা যায় এখানে। ঠাকুরমশায় বহু লোককে তাঁর গান শেখান, তারা জঁগলোরের মতো বাংলাময় সেই গান ছড়িয়ে বেড়ায়। ত্রুবাদুরদের মতো তিনিও গর্ব করতে পারেন, এ সব আমার রচনা কথায় ও সুরে।

এ কবিতার বাংলা কাব্যরূপ খানিকটা প্রভঁসাল কানৎসোনি আর প্লেইআড্‌দের গাথা, রাউণ্ডেল ইত্যাদির মাঝামাঝি। মিলের ব্যবহার অন্যরকম, বাংলাতে চার অক্ষর বা স্বরবৃত্তের মিল পাওয়া যায়, যা লিওনিন বা মধ্যযুগের অন্তমধ্যমিলান্ত ষটমাত্রিক শ্লোকের চেয়েও সূক্ষ্ম ও কঠিন।

বাংলা ছন্দবৃত্ত পশ্চিমের মধ্যে মুক্ত-ছন্দের সবচেয়ে আধুনিক বিকাশের সঙ্গেই তুলনীয়। ভাষাটাও সংস্কৃতজ। এর আওয়াজ আমার কানে শুদ্ধ গ্রীক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি লাগে।

বাংলাভাষা বিভক্তিমূলক, তাই এতে মিল সহজ। গ্রীক বা জর্মানের মতো বাংলাতে সমাস বা সন্ধি চলে। ঠাকুরমশায় বললেন, তিনি এর ব্যবহার প্রায় সব কবিতাতেই করেন।

এসব দিয়ে দেখাতে চাই যে, বাংলা ভাষা কবিতার সহায়, এর তারল্য এবং ব্যাকরণের নমনীয়তায় শব্দে সার্থক তীক্ষ্নতা আনা যায়। এ ভাষায় কথার পারম্পর্য এদিক-ওদিক করা যায়, ইংরেজির মতো অর্থের গোলমাল না করে।

ঠিক মানেটা, ধারালো সার্থকতা এতে সহজ, কারণ প্রত্যেক বস্তুরই প্রায় স্বতন্ত্র নামশব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণত ইংরেজিতে আমরা বলি স্কার্ফ, ঠাকুরমশায়ের গান শোনাতে শোনাতে অনুবাদে কথাটা এসেছিল, কিন্তু বাংলায় স্কার্ফ এক বস্তু নয়, যথা অঞ্চল ও উত্তরী বা কোঁচার খুঁট।

এ বই-এর শ'খানেক কবিতা সবই প্রায় গান। সুর আর কথা এখানে অঙ্গাঙ্গী এবং প্রাচ্যের সঙ্গীত এ বিষয়ে বিশেষ শোভন মনে হয়। প্রথমত এখানে হারমনির হাঙ্গাম নেই। দ্বিতীয়ত, গ্রীক মোড্‌স্‌এর মতো রাগ-রাগিণীর ব্যাপারটাও সাহায্য করে। কারণ এই রাগিণীতে ভাবানুষঙ্গ জাগে, ফলে বাঙালী শ্রোতা প্রথম চরণ শুনেই কবিতার স্থানকালপাত্র বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে।

রাগ-রাগিণীর এই সঙ্গতি আমার তো মনে হয় ভারী কার্যকরী।

অন্তত এতে কবিতা বা গানে একটা ধর্মাচারমূলক প্রথাসিদ্ধ শক্তি আসে এবং একটা বিশেষ কবিতা বা গান একটা স্বয়ম্ভূ খাপছাড়া ব্যাপারও থাকে না, গানের ও জীবনের একটি সর্বগ্রাহী সম্পূর্ণতার অংশমাত্র হয়। তাই এ গানে মানুষ ব্যক্তিত্বের গণ্ডী থেকে সহজে মুক্তি পেয়ে কালস্রোতে, বিশ্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণতায়, যথাযথ বিধিবদ্ধ শান্তিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

লেখকমশায় বলেন জানি না এতে আরো কিছু আছে কিনা, আমাদের কাছে এর মূল্য সমধিক, কিন্তু সে হয়তো অনুষঙ্গে। আগের সন্ধ্যায় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই অনুবাদে কি পাও? ইওরোপীয়কে টানবে ব'লে কখনো ভাবেনি।

আশ্চর্যই বা কি যে ঠাকুরমশায় বিদেশী ভাষায় গদ্যে তাঁর কবিতায় কি থাকে তাই ভাবেন, মূলের আঙ্গিক সৌন্দর্য, সুর, ছন্দ, মিলের সূক্ষ্ম মিশ্রণ এ সবই তো অনুবাদে বাদ পড়েছে।

আমি বোধ হয় তাঁর দিক থেকে সময় নষ্ট করেছি, কারণ আমি তাঁর কবি-মানস ও বক্তব্য ছেড়ে তাঁর শিল্প ও প্রকাশভঙ্গী নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করলুম।

তাঁর ভাষার যাথার্থ্য রইল। শুধু চোখে পড়লে তাঁর ইংরেজি গদ্যের গতি এড়িয়ে যাবে। চেঁচিয়ে, একটু দ্বিধান্বিত চালে পড়লেই কিন্তু ছন্দের সুষমা ও সৌকুমার্য স্পষ্ট হয়। এই ছন্দসৌভাগ্য আমার বিশ্বাস চৈতন্যের গভীরে ঘটেছে, আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল শব্দ-সুরায়ণের পরে কোনো লোক এরকম গদ্যছন্দ ব্যবহার করতে পারেন। নিজের অজ্ঞাতসারেও তিনি শব্দের বেসুরো যোজনা করতে পারেন না।

তারপর যেটা সবচেয়ে সহজে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে মধ্যে মধ্যে জ্বলজ্বলে কথা পাওয়া যায়,—কখনো বা তাতে হেলেনিক শুদ্ধি, কখনো বা দ'গুরমোঁ বা বদলেয়রের চরম নাগরিক চাল।

কিন্তু এর ভিতরে আর একে ঘিরে আছে একটা শান্ত স্থিরতা। হঠাৎ আমরা খুঁজে পেলুম আমাদের নূতন গ্রীস। রেনেসানস্-এর

সময়ে ইওরোপে যেমন সামঞ্জস্যবোধ ফিরে এল, তেমনি আমার মনে হয় যে আজকের এই যন্ত্রের বিষম ঝঞ্ঝায় আমাদের মধ্যে এল এই একটা সুস্থ ধীরতা।

অডিসির নীতি—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন, মধ্যযুগের বিড়ম্বিত চিন্তা-ধারাকে এর চেয়ে বেশি মুক্ত করতে পারেনি।

এসব কথা হঠাৎ বলছিনে, আবেগের মাথায় বা একটা বড়ো কথার ঝোঁকে। এ বিষয়ে মাসাধিক কাল ভেবেছি।

এখনো ঠাকুরমশায়ের অননূদিত অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে বলবার সময় আসেনি। যে বইটি সামনে রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় আমার জানা একটি বইই শুধু মনে পড়ছে, দান্তের পারাডিসো।

Ecco chi crescera linostri amori (ঐ দেখ! আমাদের প্রেম গুলি যিনি বিকশিত করেন) দান্তে চতুর্থ (?) স্বর্গে ঢুকে সহস্র আত্মার এই গান শোনেন। অবশ্য ব্রাহ্ম সমাজের কণ্ঠ অন্য রকম, তার অতীন্দ্রিয় ভক্তি ততটা আবেগময় নয়, বরং শান্ত। এরকম কথা— Poiche fur gioconde della faccia di dio (যেহেতু ঈশ্বরের মুখশ্রীতে এদের আনন্দ) প্রাচ্যের স্তব্ধতা ভেঙে দেবে বলেই মনে হয়।

বোধ হয় স্বর্গের মৌমাছিরা গোলাপের মধেই অন্তস্ফুট, এই দিব্য-চিত্রই রবীন্দ্রনাথের মানস লোকের চাবি।

তাঁর মধ্যে প্রকৃতির স্তব্ধতা সমাহিত। কবিতাগুলি মানসিক জলঝড় বা আগুনে তৈরি নয় ব'লে লাগে, মনে হয় তাঁর স্বাভাবিক মনের ধারণাটাই এইরকম। প্রকৃতিতে তিনি মিল পেয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে কোনো বৈষম্য বা বিরোধ নেই। প্রতীচ্যরীতির সঙ্গে এই-খানে তাঁর দারুণ তফাৎ, "মহৎ নাটক" আমরা লিখতে পারি মানুষ আর প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিষয়েই। হেলেনিক ধারণা যে, মানুষ দেবতাদের হাতের পুতুল মাত্র, এবং কি দেবতা কি মানুষ উভয়েই-ভাগ্যের ক্রীতদাস, এ ধারণা এই প্রাচ্য কবিতার বিপরীত।

ছ' মাস আগে আমি রেনেসান্সের মানবধর্ম প্রসঙ্গে লিখেছিলুম মানুষ মানুষ নিয়েই জড়িত, ভুলে যায় সমগ্রকে, দেশকালসন্ততিকে। ফলে পাই প্রথমে নাট্যের যুগ, তারপরে গদ্যের।

এ জাতের মানবধর্ম আজ স্রোত হারিয়ে শুকনো, মনে হয় বাংলা থেকে বুঝি তার সংশোধন ও সুসমীকরণ এল।

প্রমাণ করতে পারব না। মহৎ সৃষ্টির সমালোচনা প্রমাণ করার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিতেই সার্থক।

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥

একশোটার একটা গান এটি, ইংরেজিতে এর রঁদেল রূপও নেই, উন্মনা, সুকুমার সুরও নেই। ছন্দোবৃত্তের কথাটা ভাবো, প্রথম শব্দে গলার তীব্রতা, তারপরে তিন চারটি স্বরে তারই রেশ টানা, ট্রকেইকের চেয়ে দীর্ঘ ছন্দোবৃত্তে।

উধৃতির জন্যে যে কবিতাই তুলি, পরেরটা পড়ে ভাবি বুঝি ভুল করলুম। হয়তো সরল স্বীকারোক্তি সবচেয়ে ভালো সমালোচনা। ঠাকুর মশায়ের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর রচনা মেশাতে চাই না, কিন্তু এক্ষেত্রে দুই-এর সম্পর্কে এত নিকট যে, আমি দুটো কথা বলব কিছু ব্যাখ্যা না করেই সোজাসুজি।

ঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে যখন আসি, তখন নিজেকে মনে হয় যেন একটা বর্বর, পরনে জানোয়ারের ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র মোটা ভারি কাঁটাওয়ালা অস্ত্র।

একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে, হয়তো কি রকম স্বস্তি তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ঠাকুর মশায় সোফায় বসে, বাংলা থেকে পড়ে আমায় শোনাচ্ছেন, এমন সময় বাড়ির কর্ত্রীর তিন বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকে ভীষণ হাসতে আর গোলমাল করতে লাগল। কবি তক্ষুনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, ঠিক শিশুটির সুরেই।

তিনি কি হঠাৎ শিশুর উল্লাসে তার সঙ্গে এক হ'য়ে গেলেন? না এ কি প্রাচ্য ভদ্রতা? অথবা এটা কি সোজাসুজি স্বীকার যে বিশ্বের সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা আর শিশুর স্ফূর্তি একই ছকে পড়ে?

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

এ কবিতাগুলিকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভাবলে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণা বাদলে যাবে। কারণ এতে সেই তথাকথিত নেতিবাদ তো নেই, আছে গ্রহণের আলোক।...

সংক্ষেপে এ কবিতাগুলিতে আমি পাই একটা চরম শুভবুদ্ধি, যাতে করে আমাদের পাশ্চাত্য জীবনের বিশৃঙ্খলায়, শহরের গোলমালে, কলে তৈরি সাহিত্যে, বিজ্ঞাপনের ঘূর্ণিতে যে সব জিনিস চাপা পড়ে যায়, তাই আবার চোখে পড়ে।

যদি কোনো দোষ থাকে, তাহলে কবিতাগুলির সাধুভাবই হয়তো জনসাধারণের পক্ষে দোষ বলে গণ্য হবে। আমি অবশ্য তা মানি না। আমার তো করুণাই জাগে যখন দেখি কোনো পাঠক বোঝে না যে, এ সাধুতা বা ভক্তি দান্তের মতো কবিত্বজ ভক্তি এবং সুন্দর।

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীল
সে এমন মায়া কেমনে বুনিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা-সরসে।

যেদিন ফুটল কমল কিছু জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।

আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবনসমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

এই প্রশান্তিই দেখি মৃত্যুর কবিতাগুলিতে।

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।

অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।

সুইনবর্নের কবিতার আবহাওয়া অবশ্য ঠাকুরের কবিতা থেকে একেবারে আলাদা—ঠাকুর মশায় সত্যই বলতে পারেন—

আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার ;
তোমার কাছে রাখেনি আর সাজের অহঙ্কার।

নিছক স্বার্থে আমি গীতাঞ্জলির সমাদর চাই। ঠাকুর মশায়ের এছাড়াও অনেক রচনা আছে, নাটক, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি। শিশুর কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, কবে বেরোবে আগ্রহে ভাবছি।

সমালোচনায় যখন কূল পাওয়া যায় না, তখন সমালোচ্য রচনার মূল্য সম্বন্ধে নিজেকেই ব্যক্তিগতভাবে জমা রাখতে হয়।

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই॥

একথা ঠাকুরমশায় নিজের লেখার বিষয়ে খুবই বলতে পারেন, সব মহৎ শিল্পেই দূরের লোক বন্ধুতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরস্পরের শ্রদ্ধা এতে বাড়ে, অর্থবিজ্ঞানের শান্তি-প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতা দিয়ে স্বদেশ সেবার চরম করলেন। তিনি বাংলা দেশের পররাষ্ট্র বিভাগের শ্রেষ্ঠ দূত।

তাঁর কবিতার সৌন্দর্য স্পষ্টতই প্রাচ্যের, কিন্তু সংহত কঠিন। অধিকাংশ দক্ষিণ প্রাচ্যের শিল্পের অতিপ্রাচুর্য এতে নেই, আমাদের

মন এতে ব্যাহত হয় না। সর্বোপরি, তাঁর রচনা শান্ত ধীর রৌদ্রদীপ্ত, বসন্তময়।...... একটি কবিতা উধৃত করে আমার কাজ শেষ, এর পরে বলব বইটি পড়তে।

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ডেভিড হর্বার্ট লরেন্স

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমসাধ্য সৌখীনতা লরেন্সের পত্রাবলীতে একেবারেই পাওয়া যায় না। লরেন্সের রচনায় যে প্রতিভার আয়াসহীনতায় মুগ্ধ হই, সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য পাই এই পত্রাবলীর অনেকগুলিতেই। লরেন্স মারা যাবার পরে বই দুটি বেরোয়। প্রবন্ধটিতে মানবজীবন ও যীশু সম্বন্ধে যে মনোযোগ ছিল, তা নিছক সাহিত্যিক মূর্তি পেয়েছিল The Man Who Died-এ। Apocalypse তারই আরো স্পষ্ট ও যুক্তিপ্রবণ মতামতের প্রচার। মরণাহত লরেন্সের এই শয্যাশায়ী রচনার অসংশোধিত আশ্চর্য গন্ধ ভূমিকা-লেখক অলডিংটনের মতো সবাইকে অভিভূত করে। ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য জুড়ে যে কি ছন্দ আনা যায় এবং কি যুক্তির অতীত কাব্যলোক সৃষ্টি করা যায়, তা দেশছাড়া নির্যাতিত রোগীর এ শেষ রহস্যোদ্‌ঘাটনেও পাওয়া যায়। যে প্রতিভা তাঁর সব রচনাতেই অতীতে আমাদের কমবেশি অভিভূত করেছে, সেই প্রাণশক্তির আভাস এ দুটি বইয়েও ক্ষণে ক্ষণে মেলে—যদিচ চিঠিগুলি পেশাদার পত্রলেখকের নয় এবং প্রবন্ধটি টীকার সংযত রীতিতেই লেখা।

এ দুটি বই পড়ে আবার মনে হল যে লরেন্স সম্বন্ধে মুখ্য বিবেচ্য হচ্ছে এই প্রতিভাই, এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ও রূপদক্ষতাই। লরেন্স ছিলেন ব্লেকের জাতের। পৃথিবীর ব্লেকেরা, তলস্তয়েরা, থরো-রা আর যাই করুন, সাধারণ বুদ্ধির, সমাজশোভন স্বাস্থ্যের ধার ধারেন না। তাঁদের লেখায় শুধু যে সাহিত্যিক লাভ হয়, তা নয়। লরেন্স বা ব্লেকের মস্তিষ্কাতীত-বাদ আমাদের অনেকেরই জীবনবোধ ধারালো করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মতবাদে যেটুকু অনুকরনীয় সে হচ্ছে তাঁদের

The Letters of D. H. Lawrence, Edited by Aldous Huxley.
Apocalypse, by D. H. Lawrence—পরিচয়, ১৩৩৯।

সঙ্গতির আকাঙ্ক্ষা, জড়চৈতন্য বা প্রাণচৈতন্যের একচ্ছত্রতা স্বীকার নয়। সাধু পল বা গান্ধী যে রকম একদেশদর্শী মাত্রাজ্ঞানহীন, তাঁদের বিপক্ষের নেতারাও তাই। অবশ্য লরেন্স নিজেকে ঠকান্‌নি—তাঁর মতের পারমার্থিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করেন নি শুধু তার মানসিক অসম্ভবতাটুকু। ইংরেজি সাম্রাজ্যসচ্ছল রোমান্টিক উচ্ছৃঙ্খলতার শৃঙ্খল লরেন্সের কলমেও জড়ানো ছিল।

অলডস্ হক্‌স্‌লির সানুরাগ শ্রদ্ধা সেইজন্যই লরেন্সের প্রতি উৎসারিত হয়েছিল। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হিসাবে অগ্রগণ্য হলেও হক্‌স্‌লির মধ্যে ঐ একটু পলীয় ভাব, একটু সেকালের ব্রাহ্ময়ানা, দেহের প্রতি একটু বিতৃষ্ণা গোপন আছে। এবং হক্‌স্‌লি জানেন যে সে ভাবটা একেবারেই কাম্য নয়। তাই শাদা কালোর মতো হক্‌স্‌লি ও লরেন্সের বন্ধুতা। এই বন্ধুতার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে—পত্রাবলীর ভূমিকা যাতে তিনি লিখেছেন—হয়তো তাঁর প্রস্তাব কাজে রূপান্তর করা অসম্ভব, হয়তো তাঁর কথায় বা লেখায় এমন কিছু থাকত যা স্পষ্টই ভুল, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আলাপেই ধরা যাক্) আজগুবি। কিন্তু তবু বলা যায় যে তাতে কিছু এসে গেল না। আসল ব্যাপার হচ্ছে লরেন্স নিজে, তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত যে প্রাণ তার আগুন, যে আগুনের আভায় তাঁর সব লেখা ভাস্বর।

এবং ডায়েরির থেকে—এ সেই অসামান্য লোক যার জন্য আমার শ্রদ্ধা বা বিস্ময় উচ্ছাসিত। অধিকাংশ বড়ো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছি জাতে তফাৎ লাগে না। কিন্তু এ মানুষটি জাতে ভিন্ন, এর মহত্ত্ব স্বতন্ত্র শ্রেণীর, শুধু মাত্রার তারতম্য নয়। ... ... কেমন যেন আরেক জগতের লোক, অনেক বেশি সচেতন, সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা গুণীব্যক্তি তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি আবেগের শক্তিধর। এবং যদিচ লরেন্স ছিলেন অতি অমায়িক বন্ধুতাপ্রবণ ও সাদাসিধে মানুষ—তবু To be with him was to find oneself transported

out of the frontiers of human consciousness.] এই আশ্চর্য বোধশক্তিই, অগোচরজ্ঞানই, কল্পনার এই বাস্তবতাই লরেন্সের রচনাকে এবং অনেকাংশ জীবনকে অদ্ভুত করেছে। কারণ লরেন্সের আবেগ ও তার প্রকাশ-ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

লরেন্সের জীবনীর দ্বারা যে তাঁর সাহিত্যরচনার অর্থ করা যায় না, হক্‌স্‌লির একথা আমিও মানি। এবং লরেন্সের মতো আর্টিস্টের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের ছায়া যে অপেক্ষাকৃত গৌণ, তাও আমি জানি। আবেগে জীবন্ত কল্পনায়, তীব্র বোধশক্তিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বহু অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তার প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর জীবন চঞ্চল ও রচনা অসামান্য হয়ে উঠেছিলো। লরেন্সের মন ছিল হুইট্‌ম্যানের সেই শিশুর মতো, যে প্রতিদিন পৃথিবীতে নূতন ক'রে চ'লে যেত, যার কাছে বিশ্ব ছিল নিত্য নূতন আবিষ্কার। লরেন্সের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে আবিষ্কারে শুধু জানার চেনার বিস্মিত আনন্দ নেই, তাতে আছে পরিচিতের অন্তরস্থ রহস্য—সমস্ত কিছুর পরিচয়ান্তের মিলনান্তের the essential otherness, মৌল ভিন্নতা বা বিশ্বের আদি রহস্য। তাই প্রেমের বিস্ময়কর একাত্মতার মতোই, প্রেমের অতিগভীরেও যে দুই চৈতন্যের নগ্ন দ্বৈততা, সেই ভেদরহস্যও লরেন্সকে মুগ্ধ করেছিল। সভ্যতার বিজলীআলোর অভ্যাসে এই রহস্যময় উপলব্ধি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উপরি-বুদ্ধির স্পষ্টতায় অভ্যস্ত ও পল্লবগ্রাহী হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে আমাদের তাই লরেন্সকে দুর্বোধ্য লাগতে পারে। বিশেষ করেই লাগতে পারে, কারণ লরেন্সের মতে এই অপরত্ব বা otherness-এর উপলব্ধিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এইখানেই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নীতি ও সভ্যতাসংস্কারের ভিত্তি। ১৯১৪ সালে গার্নেট্‌কে লেখা এক চিঠিতে এই চৈতন্যলোকের কথাই লরেন্স্ লেখেন—

"......but somehow, that which is physic—nonhuman in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him

consistent. The certain moral scheme is what I object to. In Turgenev, and in Tolstoy and in Dostoievsky, the moral scheme into which all the characters fit—and it is nearly the same scheme—is, whatever the extraordinariness of the characters themselves, dull, old, dead. When Marinetti writes : 'It is the solidity of a blade of steel that is interesting by itself, that is, the incomprehending and inhuman alliance of its molecules in resistance to, let us say, a bullet. The heat of a piece of wood or iron is in fact more passionate, for us, than the laughter or tears of women—then I know what he means. He is stupid, as an artist, for contrasting the heat of the iron and the laugh of the woman Because what is interesting in the laugh of the woman is the same as the binding of the molecules of steel or their action in heat : it is the inhuman will, call it physiology, or like Marinetti, physiology of matter, that fascinates me. I don't so much care about what the woman feels—in the ordinary usage of word. That presumes an ego to feel with. I only care about what the woman is—what she is—inhumanly, physiologically, materially—according to the use of the word : but for me, what she is as a phenomenon (or as representing some greater inhuman will). Instead of what she feels according to the human conception … …You mustn't look in my novel for the old stable ego of the character. There is another ego, according to whose action the individual is unrecognisable, and passes through, as it were, allotropic states which it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are states of the same single radically unchanged element. (Like as diamond and coal are the same pure single element of carbon. The ordinary novel would trace the history of the diamond—but I say 'Diamond, what ! This is Carbon.' And my diamond might be coal or soot, and my theme is carbon.) চৈতন্যের এই গভীর স্তরে বারবার আসে অন্যের কঠিন অন্যতা—otherness। এই অন্ধকার নিঃসঙ্গলোক ফ্রেজার্ ও ফ্রয়েড্ পাঠান্তেও কল্পনায়

অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে। ভুল বোঝায় সে সম্ভাবনা লরেন্স্‌ও জানতেন। কিন্তু তাঁর শক্তি—হক্‌স্‌লির ভাষায় daimon বা দানো তাঁকে তবু মুক্তি দেয় নি। আর তিনি বাস্তবিক মুক্তি চান্‌ নি—নিজের স্বভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্ষমতার জ্ঞানও তাঁর ছিল—যদিও তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বন্ধু গার্নেট্‌কে লিখেছিলেন Sons and Lovers প্রসঙ্গে—It is a great tragedy, and I tell you I have written a great book। নিজের এ বিশেষ শক্তিকে লরেন্স্‌ বহু বাধা থাকলেও কখনো অপমান করেন নি, করতে পারেন নি। আর্টিস্ট চরিত্রের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে এই অসামান্য দৈবশক্তির ভার তাই লরেন্স্‌কে সারা জীবন ব্যথিত করেছে। কারণ লরেন্সের স্বভাব খুবই বন্ধুতাপ্রবণ, খুবই হৃদ্য। এবং লরেন্সের পরিচিতেরা তাঁর সঙ্গলাভে মুগ্ধই হয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের হৃদয়বৃত্তি তবুও অতৃপ্ত। ক্যাথারিন্‌ কার্স্‌ওএলকে তিনি যা লেখেন, তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও খাটে—"I think you are the only woman I have met who is so intrinsically detached, so essentially separate and isolated, as to be a real writer or artist or recorder. Your relation with other people are only excursions from yourself. And to want children and common human fulfilments is rather a falsity for you, I think. You were never made to meet and mingle, but to remain intact, essentially, whatever your experiences may be."

কিন্তু হক্‌স্‌লি যে ভাবে মরির ঈশদ নাটকীয় Son of Woman-কে উড়িয়ে দিয়েছেন, সে ভাবে বোধ হয় লরেন্সের বাল্যযৌবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর বাড়ীর ছাপ ওড়ানো যায় না। লরেন্স্‌ যে হক্‌স্‌লি হলেও হক্‌স্‌লির মতো না লিখে লরেন্সের মতোই লিখতেন, একথা হঠাৎ মানা কঠিন। অবশ্য লরেন্সের বিষয়ে এসব মতামত গৌণ। লরেন্সের স্বকপোলকল্পিত বাইব্‌ল্‌-ব্যাখ্যাও আমরা না মানতে পারি। খৃষ্টধর্ম্ম যে মানুষের স্বার্থ-পরতা ও কর্ত্তৃত্ব-কামনার বেলায় প্রায় চোখ বুজে মানব-সাধারণকে

ছেড়ে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত-স্বভাব ব্যক্তির আত্মসাধনায় ঝোঁক দিয়েছে; এবং এর ফলে যে পৃথিবীতে দুঃখ অসম্পূর্ণতা ঘৃণ্যতার বন্যা বয়ে চলেছে তার প্রতি-বিধান যে রক্তাম্বর যথার্থশাসক রাজা (বা মুসোলিনি ?) ও ক্ষাত্র আভিজাত্য, এসব তত্ত্ব শিরোধার্য না হয় করলুম। বর্তমান ইওরোপ ছেড়ে ইট্রুরিয়া, অতীত মিশর, অসভ্য মেক্সিকো বা ভারতবর্ষে মুক্তি সন্ধানেরই বা বাধ্যবাধকতা কি ? লরেন্সের আসল দান হচ্ছে তাঁর কাব্য যার উচ্ছল প্রাণবন্যা শুধু হক্স্লিদের গার্নে টদের বা মোরেল এস্কিথ্-কেই ভাসিয়া নিয়ে যায় নি, কেম্ব্রিজের পরীক্ষাগার থেকে গণিতপূজারী রসেল্‌কেও বার করেছিল। তাছাড়া এই শ-গান্ধীর মানসিক যুগেও এই আশ্চর্য সত্য কথা কেবল মৃতপ্রায় লরেন্সের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল—
What man most passionately wants is his living wholeness and his living unison, not his own isolate salvation of his "soul". Man wants his physical fulfilment first and foremost, since now, once and once only, he is in the flesh and potent. For man, the vast marvel is to be alive. For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. What ever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty, the marvel of being alive in the flesh. The dead may look after the afterwards. But the magnificent here and now of life in the flesh is ours, and ours alone, and ours only for a time. We ought to dance with rapture that we should be alive and in the flesh, and part of the living, incarnate cosmos. I am part of the sun as my eye is part of me. That I am part of the earth, my feet know perfectly, and my blood is part of the sea. My soul knows that I am part of the human race, my soul is an organic part ef the great human soul, as my spirit is part of my nation. In my own very self, I am part of my family. There is nothing of me that is alone and absolute except my mind, and we shall find that the mind has no existence by itself, it is only the glitter of the sun on the surface of water. (পৃঃ ২২২—৩, Apocalypse).

মার্কসের বস্তুবাদের মধ্যে এই নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধ-স্থাপনের দ্বৈতাদ্বৈতে সার্থক ও প্রাণবন্ত। কিন্তু লরেন্স আবেগের স্রোতে সে চিন্তায় আশ্রয় পান নি। এমন কি রিল্‌কের পক্ষেও যে নিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তি-স্বরূপের সম্বন্ধস্থাপনের মধ্যে মানসের একটা প্রগতিসন্ধান সম্ভব হয়েছিল, তাও লরেন্সে নেই। ইংরেজ সাম্রাজ্যের কুয়াসার মধ্যে তাঁর প্রাণসূর্যের দীপ্তিই আশ্চর্য ও নমস্য।

মুদ্রণপ্রমাদ

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	সে কবিতার জীবনের আবেগ কম,	সে কবিতায় জীবনের আবেগ কম,
২	রুপদানের প্রয়াস ও দিকে ঠেলা	রূপদানের প্রয়াসে ও দিকে ঠেলা
৩	মন্দ লাগে না বিশেষত যদি পিঠটা বিস্তৃক্ত হয়	মন্দ লাগে না, বিশেষত যদি পিঠটা বিস্তৃত হয়,
৩	লেখক ছন্দের কান	লেখকের ছন্দের কান
১৫	একটি জীবনীর আত্মীয়তার ঐক্যবদ্ধ হয়	একটি জীবনীর আত্মীয়তায় ঐক্যবদ্ধ হয়
১৫	নিজের আমোঘ ছন্দে	নিজের অমোঘ ছন্দে
১৫	পাঠক-দর্শক-শ্রোতা-কে নিশ্চিত-বোধে নিশ্চিতবোধে নন্দিত করে	পাঠক-দর্শক শ্রোতাকে নিশ্চিত বোধে নন্দিত করে
৫৫	এই বৈচিত্রের ইতিহাস	বৈচিত্র্যের ইতিহাস
৯২	তাঁর ইওরোপের পরিচয় মিঃশেষ	পরিচয় নিঃশেষ
৯৬	কালের ব্যপ্তির বিষয়ে	কালের ব্যাপ্তির বিষয়ে
৯৯	নিম্নস্তরের ফল	নিম্নস্তরের ফল
১০১	কবিতা হয়ে পডে গৌণ	কবিতা হয়ে পড়ে গৌণ
১০৩	গাঢ়বন্ধ বহিরঙ্গ্ রূপে	গাঢ়বদ্ধ বহিরঙ্গরূপে
১০৩	এই কথার সাক্ষ্য এমন কি	এই কথার সাক্ষ্য, এমন কি
১০৩	I seck through	I seek through
১০৪	সুরাওআদির	সুরাওআর্দির
১০৬	স্বকীয় প্রজ্ঞার প্রতি একরকম	স্বকীয় প্রজ্ঞার প্রতি এ একরকম
১০৬	টমস আর্ণল্ড	টমাস আর্ণলড
১০৭,	বৈদিক পুরুষে বা	বৈদিক পুরুষের বা
১০৮	পটভূতিতে	পটভূমিতে
১০৮	মডেলিং বাই শেডিং আকাশ	মডেলিং বাই শেডিং, আকাশ
১০৯	পারসীকে চিত্রের	পারসীক চিত্রের

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৯	A Nations Art	A Nation's Art
১০৯	স্থল শুভবুদ্ধিতেই	স্থূল শুভবুদ্ধিতেই
১১০	সুরওআর্দি	সুরাওআর্দি
১১০	জার্ম্মানিতে	জর্মানি-তে
১১০	পূর্বএসিয়ায়	পূর্ব এশিয়ায়
১১১	গবেষণাবই সার্থকতা কি	গবেষণারই বা সার্থকতা কি
১১৯	এই শ্রেণীর পবিচয়	পরিচয়
১২০	এবং মেয়ে ১'১	এবং মেয়ে ৫১'১
১২১	কিছু বলা দরকরে	দরকার
১২১	"প্রায়ই" শোনেন না কি "মধ্যে মধ্যে"	শোনেন, না কি মধ্যে মধ্যে
১২২	ওস্তাদী সঙ্গীত শতকরা ৩৫'১	৪৫'১
১২৪	নাটক ৩'	৩৯'৪
১২৪	যন্ত্রসঙ্গীত ৩'২	৩৯'২
১২৫	দফার মহিমা ব	মহিমা বা
১২৭	এড্গার ওয়ালেসের	ওআলেসের
১৩৯	লুইসের স্বদেশবাসী	স্বদেশবাসী
১৫১	এখানে মাইনজাল নেই বিদীর্ণ গহ্বর	এখানে মাইনজাল নেই নেই বিদীর্ণ গহ্বর
১৫২	জীবনের ক্ষীর্ণকটিকায়	ক্ষীণকটি কায়া
১৫২	শেষ জোতির্ময় বিশ্ব	শেষ জ্যোতির্ময় বিশ্ব
১৫৫	but in a prose translation it is just more philosophy small of course	but in a prose translation it is just 'more theosophy' Of course
১৫৫	এলেক এবেনসনের	এলেক এরনসনের
১৫৬	omnipotent literate	omnipotent literati
১৫৬	get the swedish	got the Swedish
১৫৬	biscuit complertion	biscuit complexion
১৫৬	August	august
১৬০	বৈষম বা বিরোধ	বৈষম্য বা বিরোধ